বিদ্যাসাগরের ইংরাজী জীবনচরিত, "জন্-হাউয়ার্ড," "জ্ঞান-প্রসূন" প্রভৃতি প্রণেতা ও ত্রিপুরা কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক

শ্রীশ্রীচরণ চক্রবর্ত্তি-প্রণীত।

শ্রীকেদারনাথ বসু, বি, এ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

৭৬ নং অখিল মিস্ত্রীর লেন, কলিকাতা।

১৮৯৭।

মূল্য ।৵০ ছয় আনা মা।

কলিকাতা,

৫১।২ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, "মণিকা-প্রেসে"

শ্রীঅধরচন্দ্র বসু দ্বারা মুদ্রিত।

ভূমিকা।

"জ্ঞান-কুসুম" প্রকাশিত হইল। ইহাতে গদ্য ও পদ্য উভয়বিধ রচনা সন্নিবেশিত হইয়াছে। পদ্যাংশে "বন্দনা" ব্যতীত অন্যান্য কবিতা-গুলি সংগৃহীত। গদ্যাংশে "পঞ্চবটী" শীর্ষক প্রবন্ধ রামায়ণ হইতে উদ্ধৃত। "ডি আলেমবার্ট" ও "অদ্ভুত কলহ" শীর্ষক আখ্যায়িকা দুইটী অনেক দিন পূর্ব্বে লিখিত ও বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

গ্রন্থসন্নিবিষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি সিটিকলেজের বিজ্ঞানের সিনি-য়র অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, এম্, এ, মহোদয়ের সাহায্যে লিখিত। তাঁহার নিঃস্বার্থ সাহায্যের জন্য তাঁহাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, সিটিকলেজের সংস্কৃতের অন্যতর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কুমুদ-বান্ধব চট্টোপাধ্যায়, এম, এ, মহাশয় এই গ্রন্থের প্রুফ্ সংশোধন করিয়া দিয়া আমার বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

যে সকল লেখক ও প্রকাশকগণ তাঁহাদের রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থ হইতে আমাকে এই গ্রন্থসন্নিবিষ্ট কবিতাগুলি উদ্ধৃত করিতে অনুমতি দিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম।

কলিকাতা
২৯শে মার্চ্চ
১৮৯৭।

শ্রীশ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী।

সূচিপত্র।

জ্ঞান-কুসুম।

বন্দনা।

এই যে বিশাল বিশ্ব জীবের আবাস,
কাহার ইচ্ছায় এর হইল প্রকাশ ?
কাহার অনন্ত ভাব এ আকাশ ধরে,
কাহার ইচ্ছায় বল গ্রহ তারা ফিরে ?
নর নারী পশু পক্ষী বৃক্ষ লতাগণ,
কাহার ইচ্ছায় করে জীবন-ধারণ ?
রবি কার জ্যোতি পেয়ে আলোদান করে,
কাহার সৌন্দর্য্যকণা ফোটে শশধরে ?
কাহার সুগন্ধ বায়ু করে বিতরণ,
কাহার শোভায় শোভে বন উপবন ?
কোকিল পাপিয়া আদি যত পাখীগণ,
কাহার মধুর স্বরে জুড়ায় শ্রবণ ?
সকলের মূলাধার সর্ব্বগুণাকর
তাঁর নাম দয়াময় জগৎ-ঈশ্বর।

প্রাচীন ভারত।

অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের সামাজিক, নৈতিক ও ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় অবস্থা বর্ত্তমান অবস্থা হইতে অন্যরূপ ছিল। তখন আর্য্যজাতি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণে বিভক্ত ছিল, এবং তাহাদিগের কর্ত্তব্যনিচয় প্রত্যেক বর্ণের প্রকৃতি ও অধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তৎকালে ব্রাহ্মণেরাই ব্রাহ্মণেতর জাতিগণের আদর্শস্থানীয় হইয়া ধর্ম্ম, নীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি সমস্ত উচ্চ বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব করিতেন। ব্রাহ্মণেরা সাংসারিক ভোগসুখ, রাজৈশ্বর্য্য ক্ষত্রিয় প্রভৃতিকে প্রদান করিয়া আপনারা সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনেই পরিতুষ্ট থাকিতেন। তাঁহারা সমাজের মস্তিষ্কস্বরূপ হইয়া ভাব ও চিন্তা যোগাইতেন, জনসাধারণ তাঁহাদেরই নির্দ্দেশে কার্য্য করিয়া সমাজের দৈহিক পুষ্টিসাধন করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু বিবিধ প্রতিকূল অবস্থার আঘাতে ভারতের নৈতিক, সামাজিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সকল অবস্থারই এক ঘোরতর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বর্ত্তমান ভারত দেখিয়া আর এখন সেই প্রাচীন ভারতের অবস্থা স্মরণ হয় না। কিন্তু অতীতের প্রতি মানুষের কেমন এক স্বাভাবিক আশ্চর্য্য প্রাণের টান আছে, মানুষ অতীতের সুখদুঃখ উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিতে ভালবাসে, বর্ত্তমানে মহাসুখে থাকিলেও

অতীতের সুখকেই পরমসুখ জ্ঞান করে। অতীতের প্রতি মানবপ্রাণের এইরূপ সহজ ও স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে বলিয়াই, সহস্র বাধা সত্ত্বেও, অতীতের সহিত বর্ত্তমানের এক অবিচ্ছেদ্য যোগ রক্ষা পাইতেছে, অতীতের প্রতি মানবের এইরূপ ভক্তি আছে বলিয়াই মানুষ অতীতের আদর্শে বর্ত্তমানের উন্নতি সাধন করিতে প্রয়াসী হইয়া থাকে।

প্রাচীন ভারতে চতুরাশ্রম।

ব্রহ্মচর্য্য—

বৈদিক যুগে ভারতবর্ষে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, ও সন্ন্যাস এই চারিটী আশ্রম ছিল। ক্রমে এই চতুরাশ্রম বা চতুর্ব্বিধ অবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হওয়াকেই প্রাচীন আর্য্যগণ জীবনের মহাব্রত, শ্রেষ্ঠ সুখ, ও পরম সম্পৎ জ্ঞান করিতেন।

প্রথম বর্ণত্রয়েরই ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিয়া গুরুর নিকট শাস্ত্র শিক্ষা করিবার নিয়ম ছিল। বৈদিক বিধি অনুসারে ব্রাহ্মণ বালকগণ উপনয়নের পর গুরুগৃহে গমন করিতেন। কাহাকেও ষট্‌ত্রিংশৎ, কাহাকেও অষ্টাদশ, কাহাকেও দ্বাদশ, এবং সকলকেই অন্ততঃ নয় বৎসরকাল গুরুগৃহে থাকিয়া বেদাধ্যয়ন

করিতে হইত। বেদ, বেদাঙ্গ, * এবং বেদান্ত, এই সকল শিক্ষা করাই শিষ্যগণের প্রধান কার্য্য ছিল। শিষ্যের চরিত্র-গঠনের দিকে গুরু বিলক্ষণ দৃষ্টি রাখিতেন। শিষ্য যাহাতে সংযম-শিক্ষা ও সত্য-রক্ষা করিতে সমর্থ হয়, এজন্য গুরু তাহাকে শম, † দম, ‡ উপরতি, ¶ এবং তিতিক্ষা, § অভ্যাস করাইতেন। এইরূপ কঠোর নিয়মের অধীন হইয়া চলিতে চলিতে শিষ্য শ্রদ্ধাবান্ হইয়া জ্ঞানলাভের অধিকারী হইয়া উঠিত। গুরুমুখে বেদবেদান্ত শ্রবণ করিয়া শুদ্ধ স্মৃতি-শক্তির সাহায্যে তাহা আয়ত্ত করিতে গিয়া একদিকে যেমন শিষ্যের মেধাশক্তির অপূর্ব্ব পরিচালনা ও অপরিসীম বিকাশ-সাধন হইত, অপর পক্ষে তদ্রূপ কঠোর শাসনের অধীন হইয়া জীবন-পথে অগ্রসর হইতে হইতে শিষ্যের চরিত্র সুগঠিত, হৃদয়-মন নিয়মিত, এবং সমগ্র জীবন সংযত ও নির্ম্মল হইত। "ছাত্রাণাম্ অধ্যয়নং তপঃ"; তৎকালে ছাত্রদিগের পক্ষে অধ্যয়নই প্রধান তপস্যা বলিয়া গণ্য হইত। তখন ছাত্রগণ অনন্য-মনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া অধ্যয়নকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য করিয়া জ্ঞানার্জ্জনে রত হইত। শিষ্য গুরুদেবের পদতলে

* শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, ও জ্যোতিষ

† মনঃসংযম।

‡ ইন্দ্রিয়নিগ্রহ।

¶ বৈরাগ্য।

§ ক্ষমা।

উপবিষ্ট হইয়া অনিমেষ নয়নে গুরুদেবের মুখপানে চাহিয়া থাকিত এবং তাঁহার মুখনিঃসৃত প্রত্যেক বাক্য শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়া স্মরণ রাখিতে প্রয়াস পাইত। স্বেচ্ছাচারিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা তাহাদের ত্রিসীমায় পহুঁছিতে পারিত না। দাম্ভিকতা ও আত্মম্ভরিতা কি বস্তু তাহা তাহারা জানিত না। তাহারা গুরুকে দেহ মন অর্পণ করিয়া অধ্যয়নে নিযুক্ত হইত, গুরুও শিষ্যগণকে আপনার বিদ্যাবুদ্ধি, শক্তিসামর্থ্য, দিয়া তাহাদিগকে অজ্ঞান-তিমির হইতে জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকে আনয়ন করিতে চেষ্টা করিতেন। গুরু শিষ্যগণের ভরণপোষণের সমস্ত ব্যয়-ভারবহনপূর্ব্বক তাহাদিগকে জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন। শিষ্যগণও গুরুকে পিতৃস্থানীয়, গুরুপত্নীকে মাতৃবৎ জ্ঞান করিয়া পুত্রের ন্যায় গুরুগৃহে বাস করিত। গুরু ও গুরুপত্নী ছাত্রগণকে অপত্যনির্ব্বিশেষে পালন করিতেন, ছাত্রগণের সেবা শুশ্রূষা করিতেন; ছাত্রগণও গুরুদেবের পরিবারপরিজনগণের সঙ্গে একীভূত হইয়া গুরুদেবের জন্য কাষ্ঠাহরণ, গুরুদেবের গোচারণ ইত্যাদি কার্য্য প্রফুল্ল হৃদয়ে সম্পন্ন করিত। এক গুরু বহু শিষ্যের ভার গ্রহণ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না; যাঁহার শিষ্যসংখ্যা দশ সহস্র হইত তিনি "কুলপতি" নামে অভিহিত হইতেন। ব্রহ্মচারিগণ ব্রহ্মচর্য্যের অবসানে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতেন। কিন্তু জ্ঞানের নির্ম্মল সুখে যাঁহাদের হৃদয়মন পরিতৃপ্তি লাভ করিত, জ্ঞানানন্দ-লাভ করিয়াই যাঁহাদের পার্থিব বাসনার অবসান হইত, তাঁহারা বহুকাল গুরুগৃহে বাস করিয়া

বেদাদি অধ্যয়ন করিতেন। এইরূপে কেহবা চত্বারিংশৎ বৎসর কালও গুরুর পবিত্র সহবাসে থাকিয়া জ্ঞানচর্চ্চা করিতেন এবং অধ্যাপনার যোগ্যপাত্র হইয়া, গুরুর আদেশ ক্রমে অধ্যাপনায় নিযুক্ত হইতেন।

গার্হস্থ্যাশ্রম—

"চতুর্ণামাশ্রমাণাং হি গার্হস্থ্যং শ্রেষ্ঠমাশ্রমম্।
যথা মাতরমাশ্রিত্য সর্ব্বে জীবন্তি জন্তবঃ।
বর্ত্তন্তে গৃহিণস্তদ্বৎ আশ্রিত্যেতর আশ্রমাঃ॥"

চতুরাশ্রমের মধ্যে গার্হস্থ্যাশ্রমই শ্রেষ্ঠ। যেরূপ সমস্ত জীব মাতাকে আশ্রয় করিয়া জীবন ধারণ করে, অন্যান্য আশ্রম সেইরূপ গৃহীদিগকে আশ্রয় করিয়া জীবিত থাকে।

ভক্তি, প্রীতি, স্নেহমমতা প্রভৃতি বৃত্তি সকল আছে বলিয়াই আমাদিগকে গৃহস্থ হইতে হইয়াছে। এই সকল বৃত্তির চরিতার্থ-তার জন্যই গৃহধর্ম্মপালনের প্রয়োজন। মানবান্তরে আসঙ্গ-লিপ্সাও কম প্রবল নয়। এই সকল কারণেই মানুষ সংসারা-শ্রমের গুরুতর কর্ত্তব্য-ভার বহন করিতে প্রস্তুত হয়; এই জন্যই মানুষ সংসারের দুঃখদারিদ্র্য, শোকসন্তাপ অবনত মস্তকে সহ্য করিতে স্বীকৃত হয়। গার্হস্থ্যাশ্রমে পরম আনন্দ, ও পরম শান্তি লাভ হয়। গার্হস্থ্যজীবনে যদি এইরূপ আনন্দ ও শান্তি লাভ না হইত, পরিবারে যদি স্বর্গের ছায়া বিরাজমান না থাকিত,

তবে দুর্ব্বল মানুষ কি গার্হস্থ্য-জীবনের কঠিন দায়িত্ব গ্রহণ করিতে কদাপি সমর্থ হইত ? প্রবৃত্তির আকর্ষণে, সুখের আশ্বায় ও আনন্দের প্রলোভনে মানুষ সংসারে—গার্হস্থ্যাশ্রমে ক্রীত-দাসের ন্যায় প্রবিষ্ট হয়। যে কারণেই মানুষ সংসারাশ্রমে প্রবিষ্ট হউক না কেন,সংসারাশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া,—গৃহস্থ হইয়া, মানুষ প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে। গার্হস্থ্যজীবনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই মানবের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির স্ফুরণ হইয়া থাকে। অত্যুন্নত পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিতে হইলে যেমন অপ্রশস্ত, বক্র, সঙ্কটাপন্ন পার্ব্বত্য পথ দিয়া অতি সাবধানে ও ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হয়, জীবনের সকল শক্তির স্ফুরণ করিয়া উন্নতি লাভ করিতে হইলেও তেমনি সংসারের সুখ, দুঃখ, নিন্দা, প্রশংসা, জয়, পরাজয়ের মধ্য দিয়াই জীবন-পথে চলিতে হইবে। যাঁহারা চির-কাল দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যায় শয়ান হইয়া সুখের স্বপ্ন দেখিতে চান, যাঁহারা পারিবারিক জীবনের উন্নত আদর্শ বিস্মৃত হইয়া, শুদ্ধ সাংসারিক লাভ ক্ষতি, মান অপমান, ভোগসুখকেই জীবনের প্রধান লক্ষ্য জ্ঞান করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে অভিলাষী হন, তাঁহাদিগকে চিরকালই সংসারের অশান্তিরূপ গরল পান করিয়া জর্জ্জরিত হইতে হইবে। জীবনের উচ্চ লক্ষ্য বিস্মৃত হইয়া, কেবল ক্ষুধা, নিদ্রা, ও দেহসুখের হস্তে আত্ম সমর্পণ করিলে মানবজন্মও সার্থক হয় না, সুখশান্তিও লাভ হইতে পারে না। উন্নতি লাভের শ্রেষ্ঠ অধিকার প্রাপ্ত হইয়াও

যদি মানুষ চিরকাল সমাবস্থায়ই থাকে,—কাম ক্রোধাদির অধীনই থাকে, তবে আর মানবজীবনের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়? উন্নতিসাধনের আকাঙ্ক্ষা ও উৎকর্ষলাভের শক্তি পাইয়াই মানুষ প্রাণিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও এই উন্নতিসাধনের অধিকার আছে বলিয়াই মানব বর্ব্বরাবস্থা হইতে সুসভ্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু বিশুদ্ধ প্রণালীর অনুগত হইয়া উন্নতি সাধনের চেষ্টা না করিলে মানব পাশব-ভাব ধ্বংস করিয়া কখনও মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে না। প্রবৃত্তির সংযতাবস্থায়ই মানুষ মনুষ্য পদবাচ্য, অসংযতাবস্থায় পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। সংযম শিক্ষার জন্যই গার্হস্থ্যজীবনের প্রয়োজন। এই জন্যই প্রাচীনকালে গৃহস্থের পক্ষে পঞ্চযজ্ঞের ব্যবস্থা ছিল। গৃহস্থকে প্রতিদিন দেবযজ্ঞ,* ঋষিযজ্ঞ,† পিতৃযজ্ঞ,‡ ভূতযজ্ঞ,¶ নৃযজ্ঞ,§ এই কয়েকটী অনুষ্ঠান শ্রদ্ধার সহিত সম্পন্ন করিতে হইত।

---

* দেবার্চ্চনা।

† ঋষি প্রণীতশাস্ত্রাদি পাঠ।

‡ পিতামাতার জীবিতাবস্থায় পাদসেবন এবং পরলোক গমনের পর শ্রাদ্ধ তর্পণাদি।

¶ নিকৃষ্ট প্রাণিগণকে আহারীয় ও পানীয় দান।

§ অভ্যাগতের সৎকার, সহজ কথায়, অতিথিসেবা।

বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—

ব্রহ্মনিষ্ঠ ও অনাসক্ত হইয়া গৃহধর্ম্ম পালন করিতে করিতে যখন বিষয়-বাসনার বিরাম ও সংসার-বন্ধন ছিন্ন হইত, তখন গৃহিগণ বনগমন করিতেন এবং বনবাসে থাকিয়া ঈশ্বরলাভের জন্য ভজন সাধনে রত হইতেন। এই অবস্থায় বাস করিতে করিতে মোহ-বন্ধন একবারে ছিন্ন হইলে, সকল সংশয় এককালে দূরীভূত হইলে, পতি পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ করিতেন। সন্ন্যাসাশ্রমই তৎকালে আর্য্যসন্তান-গণের জীবনের উচ্চ লক্ষ্য ছিল। কিন্তু তখন গার্হস্থ্যধর্ম্মকে অতিক্রম করিয়া কেহই সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণে অধিকারী ছিলেন না। গৃহধর্ম্মের অনুষ্ঠান সকল উপেক্ষা করিয়া—গৃহীর কর্ত্তব্য সকল অবহেলা করিয়া কাহারও সন্ন্যাসী হইবার ব্যবস্থা ছিল না। এ সম্বন্ধে মহাভারতে একটী সুন্দর উপাখ্যান প্রাপ্ত হওয়া যায়। উপাখ্যানটী এই। পূর্ব্বকালে কতকগুলি অজাত-শ্মশ্রু ব্রাহ্মণপুত্র ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করাই যথার্থ ধর্ম্ম, এইরূপ বিবেচনা করিয়া গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মচারিবেশে বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তদ্দর্শনে তাঁহাদিগের প্রতি সদয় হইয়া হিরণ্ময় পক্ষীর বেশ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সমক্ষে কহিলেন, "যাঁহারা প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে পিতৃলোক, অতিথি, দেবতা ও আত্মীয়গণকে অন্ন প্রদান পূর্ব্বক আপনারা অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করেন তাঁহারাই বিঘসাশী। বিঘসাশীরা যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, প্রাকৃত মনুষ্যের

পক্ষে তাহা নিতান্ত সুকঠিন। ঐ কর্ম্ম দ্বারা পুণ্যসঞ্চয়, জীবনের সার্থকতা ও অন্তে সদ্গতি লাভ হইয়া থাকে।” তখন সেই ব্রাহ্মণকুমারগণ পক্ষীর বাক্য শ্রবণে পরস্পরকে কহিলেন, “ঐ দেখ, এই বিহঙ্গম বিঘসাশীদিগের প্রশংসা করিতেছে। আমরা বিঘসাশী, অতএব এ প্রশংসা আমাদিগেরই,তাহাতে আর সন্দেহ নাই।” তখন বিহঙ্গম কহিলেন, “হে তাপসগণ! তোমরা পঙ্কদিগ্ধাঙ্গ, রজোগুণযুক্ত, উচ্ছিষ্টভোজী ও মন্দবুদ্ধি; তোমরা কখনওই বিঘসাশী নও, আমি তোমাদিগকে প্রশংসা করি নাই।”

ব্রাহ্মণপুত্রেরা কহিলেন, “বিহঙ্গম! আমরা এইরূপে অবস্থান করাই উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম জ্ঞান করিয়া ইহাতে রত হইয়াছি। ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কর্ত্তব্য থাকিলে তাহার উপদেশ প্রদান কর। আমরা তাহাতেই সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিব।” তখন পক্ষী কহিলেন, “হে তাপসগণ! কর্ম্ম ত্যাগ করিলে কদাপি সিদ্ধি লাভের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রধান উপায় গৃহস্থাশ্রম অতি পবিত্র ও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যাহারা কর্ম্মের নিন্দা করিয়া কুপথে পদার্পণ করে, তাহারা নিতান্ত মূঢ় ও পাপাত্মা। গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক বিবিধ পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে যথার্থ তপোঽনুষ্ঠান করা হয়। অতএব তোমরা ঐরূপ কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। প্রতিদিন যথানিয়মে দেবার্চ্চনা, পিতৃতর্পণ, ব্রহ্মোপাসনা ও গুরুজনের পরিচর্য্যা করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। উহা অনুষ্ঠান করিতে পারিলেই

সিদ্ধি লাভ হয়। দেখ, দেবতারা ঐরূপ দুরূহ তপোঽনুষ্ঠান করিয়া পরম ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব আমি তোমাদিগকে সুকঠিন গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে উপদেশ প্রদান করিতেছি। গার্হস্থ্যধর্ম্ম প্রতিপালনই মানবদিগের মহা তপস্যা; উহার অনুষ্ঠান দ্বারা সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি লাভ হইতে পারে। রাগ-দ্বেষ-শূন্য নির্ম্মৎসর ব্রাহ্মণগণ গার্হস্থ্যধর্ম্মানুষ্ঠানকে তপস্যা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। হে তাপসগণ! বিঘসাশী-দিগের ন্যায় কঠোর নিয়ম পালন করিতে কেহই সমর্থ নহেন। তাঁহারা আপনাদিগের কঠোর ব্রতানুষ্ঠানের ফলে ইহলোকে জনসমাজে সম্মানভাজন হইয়া অন্তে অনন্তকাল নিরাপদে ইন্দ্র-লোকে বাস করিয়া থাকেন।" ব্রাহ্মণকুমারেরা সেই বিহঙ্গের বাক্য শ্রবণে সন্ন্যাসধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রম আশ্রয় করিলেন।

"শান্তিপর্ব্ব।"

অবস্থার অহঙ্কার।

ওহে ধনি অভিমানি, কেন অভিমান?
বল হে মানব মনে, এ ক্ষুদ্রতা কি কারণে
তুমি উচ্চ আমি তুচ্ছ কেন হেন জ্ঞান?
যে সম্পদ-গর্ব্বে মত্ত মানস তোমার,
কি সম্পর্ক তব সনে আছে বল তার?

চঞ্চলা কমলা সদা, অচলা কোথায় ?
পদ্ম-পত্রে যেন জল, সদা করে টলমল
সতত আশঙ্কা মনে কখন যে যায়।
কে জানে পলক পরে রয় কিনা রয়,
হেন ধন-গর্ব্বে মত্ত মূর্খ অতিশয়।

কে করে তোমার বল মন্ত্রণা বিশ্বাস ?
তোমার আদর যাহা, জ্ঞানীর নয়নে তাহা
ধনের গৌরব মাত্র ; তুমি তার দাস ;
এক দিকে তোমা রাখি অন্য দিকে ধনে,
কি মূল্য তোমার হয় ভাব দেখি মনে ?

মানব-অদৃষ্ট-চক্র ঘুরিছে নিয়ত,
রাজপুত্র বনে যায়, রাখাল রাজত্ব পায়
অদৃষ্টের বিনিময় ঘটিতেছে কত।
চিরকাল এ সংসার সুখদুঃখময়
দেখিয়াও ধনগর্ব্ব উচিত কি হয় ?

শ্রীমনোরঞ্জন গুহ।

"পবিত্রতা-সমিতি।"

এই নামে ইংলণ্ডে একটি সমিতি আছে। যৌবনোন্মুখ বালকগণ এই সমিতির সভ্য হইয়া থাকেন। কিছুকাল হইল এই সমিতির একখানি অনুষ্ঠান-পত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছিল। আমরা তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদান করিতেছি। আশা করি ইহা পাঠে আমাদের দেশীয় বালকগণেরও বিশেষ উপকার হইবে।

পবিত্রতা-সমিতির বিশ্বাস।

"যাঁহাদের হৃদয় পবিত্র তাঁহারাই ধন্য, তাঁহারাই ভগবানকে দর্শন করিবার অধিকারী।"

সমিতির উদ্দেশ্য।

"আমি যাবজ্জীবন সৎ ও নির্ম্মল থাকিব।"

প্রতিজ্ঞা।

১। "যে স্থানে অশ্লীল কথা হইবে বিরক্তির সহিত সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিব; এবং যে সকল অশ্লীল বাক্য কর্ণে প্রবিষ্ট হইবে তাহা স্মৃতি হইতে মুছিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিব।"

২। "যে সকল গ্রন্থপাঠে ও চিত্রদর্শনে চিত্তে অপবিত্র ভাবের উদ্রেক হয় তাহা কখনও স্পর্শ করিব না।"

৩। "যে সকল চিন্তা, বাক্য এবং কার্য্য আমি লজ্জাবশতঃ আমার প্রিয়তম সুহৃৎ হইতেও গোপনে রক্ষা করিতাম, পরমেশ্বর করুন, যেন আমি তাহা হইতে মুক্ত থাকিতে পারি।"

৪। "আমি আমার জননী, ভগিনী এবং সমস্ত স্ত্রীজাতিকে ভক্তি করিব ও তাঁহাদের সম্ভ্রম রক্ষা করিব।"

৫। "ঈশ্বর করুন, যেন আমি নিজে পবিত্র থাকিয়া আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও সঙ্গিগণকে নির্ম্মল রাখিতে পারি।"

নূতন, কোমল মৃৎপাত্রলগ্ন রেখা সকল যেমন কখনও লুপ্ত হয় না, কোমলস্বভাব বালকগণের প্রাণে বাল্যাবস্থায় যে সকল সংস্কার জন্মে তাহাও তদ্রূপ প্রায়ই বিনষ্ট হইতে দেখা যায় না।

ভরতের অযোধ্যাত্যাগ, শ্রীরামের দর্শনলাভার্থ যাত্রা এবং পথে গুহকের সহিত সাক্ষাৎ।

রামেরে আনিতে যায় সমস্ত কটক।
বাল বৃদ্ধ কেহ কারো না মানে আটক।
অনন্ত সামন্ত চলে যুদ্ধসেনাপতি।
ভরতের মতে চলে রথী মহারথী॥
আছেন যমুনা পারে রাম বনবাসে।
ভরত গেলেন তবে শৃঙ্গবের দেশে॥
পৃথিবী যুড়িয়া ঠাট এক চাপে যায়।
গঙ্গাতীরে বৈসে গুহ করে অভিপ্রায়॥
কোন রাজা আইসে বুঝি যুদ্ধ করিবারে
আপনার ঠাট গুহ একঠাঁই করে॥
চিনিলেক বিলম্বে সে অযোধ্যার ঠাট।
আপন কটকে গুহ আগুলিল বাট॥
গুহ বলে দেখি ভরতের সেনাগণ।
শ্রীরামের সাথে আইসে করিবারে রণ॥
পরা'ল বাকল তারে পাঠাইল বনে।
রাজ্যখণ্ড নিল তবু ক্ষমা নাহি মনে॥

সাজরে চণ্ডাল ঠাট চাপে দিয়া চড়া।
বিষম শরেতে মুই কাটি হাতী ঘোড়া॥
মার্ মার্ বলিয়া দগড়ে দিল কাঠি।
হেনকালে গুহ বলে ভরতেরে ভেটি॥
শুনরে চণ্ডালগণ ব্যস্ত হও নাই।
আসিল ভরত শ্রীরামের ছোট ভাই॥
যদি সে ভরত শ্রীরামেরে করে রাজা।
ভালমতে করি তবে ভরতের পূজা॥
ভরত আসিয়া থাকে শত্রুভাবে যদি।
ভরতের ঠাট কাটি বহাইব নদী॥
সাত পাঁচ গুহ ভাবিতেছে মনে মন।
হেনকালে সুমন্ত্র কহেন সুবচন॥
আইলেন শ্রীরামেরে লইতে ভরত।
বল গুহ শ্রীরাম গেলেন কোন পথ॥
ভরতেরে তবে গুহ নোয়াইল মাথা।
ভেট দিয়া গুহ তারে কহে সব কথা॥
ভরত বলেন শুন চণ্ডালের রাজা।
কত দিন শ্রীরামেরে করিলা হে পূজা॥
গুহ বলে এখানে ছিলেন দুইরাতি।
দুইরাত্রি একঠাঁই ছিলাম সংহতি॥
এই পথে গেলেন তাঁহারা মহাবনে।
গঙ্গাপার করিয়া রাখিনু তিনজনে॥
গুহস্থানে পাইয়া সকল সমাচার।
সেই পথে গমন হইল সবাকার॥

তাহা এড়ি ভরত কতকদূরে গেলে,
তৃণশয্যা দেখিলেন এক বৃক্ষতলে ॥
তদুপরে শুয়েছিলা রাম বনবাসী।
তৃণলগ্ন আছে পাট কাপড়ের দশী।
আছাড় খাইয়া পড়ে ভরত ভূতলে।
সুমন্ত্র ধরিয়া তাঁরে লইলেক কোলে ॥
ভরত রামের শোকে হইল অজ্ঞান।
ভরতের ক্রন্দনেতে বিদরে পরাণ ॥
ভরত বলেন গুহ শ্রীরামের মিত।
করিতে তোমার পূজা আমার উচিত ॥
যাঁরে কোল দিয়াছেন আপনি শ্রীরাম।
তাঁহারে উচিত হয় করিতে প্রণাম ॥
আপনি ভরত তারে দেন আলিঙ্গন।
সুগন্ধি চন্দন দেন বহুমূল্য ধন ॥
প্রসাদ পাইয়া গুহ গেল নিজ দেশে।
ভরত গেলেন তবে রামের উদ্দেশে ॥

কৃত্তিবাস-পণ্ডিতবিরচিত রামায়ণ। অযোধ্যাকাণ্ড।

পঞ্চবটী।

রাম নানাবিধ সর্প ও মৃগসমূহে সমাকুলা পঞ্চবটীতে যাইয়া প্রদীপ্ততেজা ভ্রাতা লক্ষ্মণকে কহিলেন, "হে শুভদর্শন! মহর্ষি অগস্ত্য যে প্রদেশের কথা বলিয়াছিলেন, আমরা সেই নিয়ত-পুষ্পসমন্বিত-কানন-শোভিত পঞ্চবটী নামক প্রদেশে আগমন করিয়াছি। তোমার আশ্রমোচিত প্রদেশ-পরিজ্ঞানে সম্যক্ নৈপুণ্য আছে; অতএব তুমি, কোন্ প্রদেশে আমাদিগের অভিমত আশ্রম হইতে পারে, তাহা অবধারণ করিবার নিমিত্ত এই কাননের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ কর। লক্ষ্মণ! যে প্রদেশের নিকট রমণীয় কানন ও জলাশয় আছে; যথায় সমিৎ, পুষ্প ও কুশ সুলভ এবং যথায় বিদেহ-রাজ-দুহিতা সীতার, তোমার ও আমার চিত্ত প্রসন্ন হয়, তুমি এরূপ এক প্রদেশ অবলোকন কর।" লক্ষ্মণ বলিলেন, "হে কাকুৎস্থ! আমি ত স্বাধীন নহি; অতএব আপনি স্বয়ং মনোহর প্রদেশ অবধারণ করিয়া আমাকে তথায় আশ্রম নির্ম্মাণ করিতে আদেশ করুন।"

রাম প্রাণতুল্য লক্ষ্মণের বাক্যে অত্যন্ত প্রীত হইয়া স্বয়ং এক সর্ব্বগুণান্বিত প্রদেশে বাস করিতে অভিপ্রায় করিলেন। পরে তিনি সেই মনোহর প্রদেশে যাইয়া সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের হস্তদ্বয় হস্তদ্বারা ধারণ করত আশ্রম-নির্ম্মাণ-বিষয়ে তাঁহাকে এই বাক্য

বলিলেন, "এই প্রদেশ সমতল, পুষ্পিত-বৃক্ষ-সমূহে পরিব্যাপ্ত ও অতীব শোভাযুক্ত; তুমি এইস্থলে যথাযোগ্য রমণীয় আশ্রম নির্ম্মাণ কর। অনতিদূরে ঐ যে সূর্য্যসদৃশ উজ্জ্বল সুগন্ধ পদ্ম-সমূহে শোভিতা রমণীয়া নদী দেখা যাইতেছে, যাহার উভয় তট পুষ্পসমন্বিত বৃক্ষ সমূহে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, যাহার অনতিদূরে ও অনতিনিকটে মৃগগণ বিচরণ করিতেছে, এবং যাহা হংস ও কারণ্ডবগণে সমাকীর্ণা এবং চক্রবাকসমূহে শোভিতা রহিয়াছে, ঐ রমণীয়া নদী সেই গোদাবরী। সাল, তাল, তমাল, খর্জ্জূর, পনস, তিমিশ, নীবার, পুন্নাগ, আম্র, অশোক, কেতক, চম্পক, চন্দন, খদির, শমী ও পাটল; এই সমস্ত গুল্মপরিবৃত ও লতা-সমন্বিত পুষ্পিত বৃক্ষে পরিব্যাপ্ত, ময়ূরশব্দে নিনাদিত, বহু কন্দর-যুক্ত, উচ্চ ও রমণীয় অনেক শুভদর্শন পর্ব্বত দৃষ্ট হইতেছে। ঐ সকল পর্ব্বতে স্থানে স্থানে গজসকল সুবর্ণ, রজত ও তাম্র-বর্ণ বিচিত্র রচনা দ্বারা অলঙ্কৃতের ন্যায় শোভা পাইতেছে। হে সুমিত্রানন্দন! এই স্থান রমণীয়, পুণ্যজনক, এবং বিবিধ মৃগ ও পক্ষিসমূহে সেবিত; অতএব আমরা এই পক্ষিদিগের সহিত এই স্থানেই বাস করিব।"

বর্দ্ধমানাধিপতি ৺মহতাব চন্দ্ বাহাদুর মহোদয়ের ব্যয়ে-অনূদিত রামায়ণ।

জীবনের সুখ।

মানবজীবনের সদ্বৃত্তিসকলের সম্যক্ পরিচালনে ও সম্পূর্ণ স্ফুরণেই প্রকৃত সুখ। সচরাচর লোকের মনে এই একটি সংস্কার প্রবল যে, স্বেচ্ছাচারী লোকেরা যেরূপ আহারে, বিহারে সর্ব্বপ্রকারে জীবনের সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকে, মিতাচারী ব্যক্তিগণের ভাগ্যে তাহা ঘটে না। মিতাচারী লোকের জীবনে যে কোনও সুখ আছে তাহাও এই শ্রেণীর লোকেরা কল্পনা করিতে পারে না। কিন্তু ইহা একটি ভ্রম। যাঁহারা পাশব বৃত্তিগুলি সংযত রাখিয়া জীবন যাপন করেন, তাঁহারা মানসিক ও নৈতিক আদর্শানুসারে উচ্চতর ও অধিকতর পবিত্র সুখ লাভ করিয়া থাকেন। যাঁহাদের দেহ সুস্থ, মন নির্ম্মল, তাঁহাদের সুখের অভাব কি? তাঁহাদের জীবনধারণোপযোগী বস্তুরইবা অসদ্ভাব কোথায়? তাঁহারা প্রকৃতির আদরের সন্তান। তাঁহাদের মনে বিশুদ্ধ স্বর্গীয় সুখের উদয় হইবে এজন্য প্রকৃতি দেবী আপনাকে বিবিধ প্রকারে নির্ম্মল সৌন্দর্য্যে সুশোভিত করিয়া রাখিয়াছেন। সান্ধ্য আকাশের প্রশান্তমূর্ত্তি, প্রভাতের সুস্নিগ্ধ সমীরণ, রবির তেজোময় জ্যোতিঃ, বিহঙ্গের সুললিত, হৃদয়োন্মাদক গীতি, এ সকলে কি জীবনের সুখ হয় না? এ সকলে কি হৃদয় মনের তৃপ্তিসাধন হয় না? বৃক্ষলতাদির কমনীয় কান্তি

দর্শন করিয়া, মনোহর পুষ্পের অপার সৌন্দর্য্যরাশি উপভোগ করিয়া হৃদয়ের যে সুখ ও আনন্দ লাভ হয় বহুমূল্য বিলাসের সামগ্রী উপভোগ করিয়াও তাহা হইতে পারে না। মানবের চিত্তরঞ্জনের জন্য প্রকৃতির অক্ষয় ভাণ্ডারে অসংখ্য বস্তু সম্মিলিত রহিয়াছে। যাহারা সংসারের নীচ ভাব লইয়া, সামান্য পদার্থ লইয়াই, সন্তুষ্ট থাকিতে চায়, তাহারা আপনাদের দোষেই জীবনের অতি পবিত্র সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকে ; তাহারা ইচ্ছা করিয়াই প্রকৃতির পরম রমণীয় শোভা নিরীক্ষণ না করিয়া অন্ধের ন্যায় কালযাপন করে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য, নরনারীর সুঠামরূপ, সুমধুর গীতবাদ্য, চিত্তহারিণী কবিতা, সাধুর মধুময় সহবাস, শিশুর সুমিষ্ট হাসি এ সকলই আমাদের সুখ ও আনন্দের জন্য। কিন্তু আবিল সলিলে যেমন চন্দ্রমার জ্যোৎস্নারাশি বিভাসিত হয় না, মলিন, ক্ষুদ্র ও স্বার্থপর হৃদয় লইয়াও তেমনি কেহ কখনও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়া চিত্ত বিনোদন করিতে সমর্থ হয় না।

সকলের অন্তরেই চিত্ত-রঞ্জিনী বৃত্তি আছে বটে, কিন্তু হিংসা ও পরনিন্দা, কুচিন্তা ও কদাচার, অহঙ্কার ও দম্ভ, স্বার্থপরতা ও সুখাসক্তি পরিত্যাগ করিয়া নির্ম্মলতা ও নিঃস্বার্থতা লাভ করিতে না পারিলে এই বৃত্তির সম্যক্ স্ফূর্ত্তিলাভ হয়না। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে সুখী হইতে হইলে একদিকে যেমন সরল ও নির্ম্মল হওয়া আবশ্যক, অপরদিকে তেমনি আত্মসুখ খর্ব্ব করিয়া অপরের সুখের জন্য কার্য্য করা প্রয়োজন। কেবল 'কই সুখ' 'কোথায়

সুখ’ বলিয়া ক্রন্দন করিয়া বেড়াইলে চিরকাল যাতনাই জীবনের সার হইবে।

রাজা রামমোহন রায়।

রামমোহন রায় আমাদের দেশের একজন বড় লোক। তিনি সাতিশয় ধনী ছিলেন না, বিষয় বিভবও তাঁহার অধিক ছিল না। তবে কেন তাঁহাকে বড়লোক বলিব? তাঁহার ন্যায় বুদ্ধিমান, পণ্ডিত, ও ধার্ম্মিক লোক এদেশে অতি অল্পই জন্মিয়াছে। এই সকল গুণেই তাঁহাকে সকলে বড়লোক বলিয়া মান্য করে। তিনি ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে, হুগলী জেলার অন্তঃপাতী রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পঞ্চম বর্ষে রামমোহনের বিদ্যারম্ভ হয়। হাতে খড়ি দেওয়া হইল, রামমোহনেরও নিত্য নূতন নূতন বিষয় সকল জানিবার ইচ্ছা বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। তখন রাধানগরে পাঠশালা ছিল না। রামমোহন লেখাপড়া শিখিবার জন্য জ্যেষ্ঠভ্রাতা জগমোহন রায়ের সঙ্গে তাঁহার কর্ম্মস্থানে গেলেন। রাধানগর হইতে সেস্থান অনেক দূরে ছিল। কিন্তু রামমোহনের লেখাপড়া শিখিবার ইচ্ছা এতই প্রবল ছিল যে, পঞ্চমবর্ষীয় শিশু রামমোহন অক্লেশে মাতৃক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া ভ্রাতার সঙ্গে দূরদেশে চলিয়া গেলেন। জ্যেষ্ঠের নিকট

থাকিয়া তিনি সর্ব্বদাই মনোযোগের সহিত লেখাপড়া করিতে লাগিলেন। সেই শৈশবাবস্থায়ও শিক্ষাবিষয়ে তাঁহার বেশ অনুরাগ ছিল। তিনি যত্নের সহিত লেখাপড়া শিক্ষা করিতেন, লেখাপড়া লইয়াই দিন কাটাইতেন। ভ্রাতাকে কখনও কোন বিষয়ে বিরক্ত করিতেন না। কেবল একদিন দুগ্ধ পান করিতে না চাহিয়া একটুকু অবাধ্যতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ভৃত্যেরা রামমোহনকে দুধ খাওয়াইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল; তাহারা রামমোহনকে মিষ্ট বাক্যে ভুলাইয়া দুধ খাওয়াইতে পারিবে বড়ই আশা করিয়াছিল, কিন্তু রামমোহন বড় সহজে ভুলিবার ছেলে ছিলেন না। তিনি যখন যাহা ধরিতেন তাহা সহজে ছাড়িতেন না। সকলের চেষ্টা যখন বিফল হইল, তখন জগমোহন রায় স্বয়ং চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি নানা উপায়ে রামমোহনের গোঁ ফিরাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একে একে যখন সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল, তখন জগমোহন রায় নিতান্ত বিরক্তির সহিত বলিয়া উঠিলেন, "এরূপ অবাধ্য ছেলেকে কালই মার কাছে পাঠিয়ে দিব।" আর অধিক কথার প্রয়োজন হইল না। রামমোহন দ্বিরুক্তি না করিয়া মাথা হেঁট করিয়া দুগ্ধ পান করিলেন। কিছুকাল পরে ভ্রাতার নিকট হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। বাড়ী আসিয়া অল্পদিনমাত্র মাতার নিকট ছিলেন। কিন্তু এই অল্পদিনের মধ্যেই তিনি পিতার সাহায্যে কিঞ্চিৎ পারসী শিক্ষা করেন। গৃহে বসিয়া পিতার নিকট কিঞ্চিৎ শিক্ষালাভ করিয়া রামমোহন পারস্য ও আরব্য

ভাষা আয়ত্ত করিবার জন্য নবমবর্ষ বয়ঃক্রমকালে পাটনা নগরে গমন করেন; এবং প্রায় দুইবৎসরকাল পাটনায় থাকিয়া এই দুইটী কঠিন ভাষায় বিশেষ অধিকার লাভ করিলেন। পাটনা হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া রামমোহন কিছুকাল পিতামাতার নিকট ছিলেন, এবং প্রায় ত্রয়োদশ বৎসর বয়সের সময় সংস্কৃত সাহিত্য ও হিন্দুশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিবার জন্য কাশী যাত্রা করিলেন। তখন রেলের গাড়ী ছিলনা, হাঁটিয়া কাশী যাইতে হইত। সুতরাং কাজেই কাশী যাওয়া বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। কিন্তু রামমোহনের হৃদয়ে সংস্কৃত শিখিবার উৎসাহ ও আনন্দ এতই প্রবল ছিল যে, তাঁহার অন্তরে কোনও ভয় ভাবনাই স্থান পাইল না। কাশী পহুঁছিয়া রামমোহন একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের শিষ্য হইলেন, এবং প্রায় দুইবৎসরকাল গুরুর নিকট থাকিয়া হিন্দুশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিলেন। এই দুইবৎসরেই তাঁহার অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান ও অসামান্য ভাষা-নৈপুণ্য জন্মিল। ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি ভারতের উত্তর সীমা অতিক্রম করিয়া তিব্বৎ দেশে গমন করেন। এই সময়ে তিনি ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভ্রমণ করিয়া অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করেন। একুশ কি বাইশ বৎসরের সময় তিনি গবর্ণমেণ্টের অধীনে একটী সামান্য কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন, এবং তখন হইতেই ইংরেজী ভাষা শিখিতে আরম্ভ করেন। অসামান্যপ্রতিভাবলে অতি অল্পদিনের মধ্যেই রামমোহন ইংরেজী ভাষায় বিশেষ অধিকার লাভ করিতে সমর্থ হন।

অতি অল্পকালের মধ্যেই রামমোহন কার্য্যদক্ষতাগুণে জজ-আদালতের সেরেস্তাদারের কর্ম্মে উন্নীত হইলেন। সেকালে এইরূপ কাজেই বিশেষ মানমর্য্যাদা, গুরুতর দায়িত্ব এবং অধিক বেতন প্রাপ্তি ছিল। রামমোহন রায় বড় বেশীদিন সরকারী কার্য্য করেন নাই। কয়েক বৎসর কাজ করিয়া কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়া লইয়া তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, এবং কর্ম্মত্যাগের পর কলিকাতায় আসিয়া নানারূপ দেশ-হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। ইংরেজী শিক্ষা প্রচলন, বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধন প্রভৃতি বিবিধ দেশ-হিতকর কর্ম্মে অর্থ সামর্থ্য ব্যয় করিয়া অবশেষে তিনি ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে গমন করেন এবং ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে, ২৭ শে সেপ্টেম্বর, ব্রিষ্টলে দেহত্যাগ করেন।

সংসারের ধন মান, বিষয় সম্পত্তির সঙ্গে যুক্ত থাকিয়াও রামমোহন রায় অনাসক্ত রাজর্ষির ন্যায় ধর্ম্মসাধন, স্বদেশের সেবা এবং জনসমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। এবিষয়ে তাঁহার জীবন সকলেরই আদর্শস্থানীয় ও অনুকরণীয়।

দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ।

ভীম দুর্য্যোধন, করে মহারণ,
দেখে সবে কুতূহল।
দেখিতে সমর, লইয়া অমর,
আইলেন আখণ্ডল॥
চড়িয়া বাহন, করে আগমন,
তেত্রিশকোটি অমর।
যার যেই বেশ, করিয়া বিশেষ,
বসিল যুড়ি অম্বর॥
হংসে পদ্মাসন, বৃষে পঞ্চানন,
পার্ব্বতী কেশরী যানে।
দেব জলেশ্বর আইল সত্বর,
চড়িয়া নিজ বাহনে॥
হরিণে পবন, নরে বৈশ্রবণ,
মূষিকে বিঘ্ননাশন।
হইয়া কৌতুকী, চাপি মত্তশিখী,
আইল দেব ষড়ানন॥
সব স্থানে স্থানে বসিলেন যানে,
দেখেন সমর রঙ্গ।
ভীম দুর্য্যোধন, দোঁহে করে রণ,
উঠিল রণ তরঙ্গ॥

দুই মহাবলী, গদা স্কন্ধে তুলি,
ফিরায় মণ্ডলী করি।
সঘনে গর্জ্জন, করে দুইজন,
যেমন দুই কেশরী॥
যেন দুই হাতী, ধায় দ্রুতগতি,
পদভরে কাঁপে ক্ষিতি।
দুই বৃষে যেন, করয়ে গর্জ্জন,
কম্পিত শেষাহিপতি॥
পূরিয়া সন্ধান, কৌরব প্রধান,
ভীমেরে মারিল গদা।
পুষ্পমালা প্রায়, বৃকোদর তায়,
নাহি কিছু পায় ব্যথা॥
দুই গদাঘাত, যেন বজ্রাঘাত,
ঠনঠনি শব্দ শুনি।
দুর্য্যোধন অঙ্গে, ভীম মহারঙ্গে,
করে গদার ঘাতানি॥
মহা গদাঘাত, খায় কুরুনাথ,
পড়িল ধরণীতলে।
পড়ি ক্ষণমাত্র, ধৃতরাষ্ট্রপুত্র,
সেইক্ষণে উঠে বলে॥
পুনঃ দুই বীরে, গদা ল'য়ে করে,
মণ্ডলী করিয়া ফিরে।
গদার প্রহার, করে মহামার,
দুজনে মারে দোঁহারে॥

রাজা দুর্য্যোধন, হয়ে কোপমন,
গদা প্রহারিল ভীমে।
বীর বৃকোদর, কাঁপি থর থর,
সঘনে পড়িল ভূমে॥

* * *

দৈবের কারণ, না যায় খণ্ডন,
দুর্য্যোধন লাফ দিতে।
ভীম গদাঘাত, যেন বজ্রাঘাত,
বাজে তাহার উরুতে॥
লোক দেখে রঙ্গে, দুই উরু ভঙ্গে,
ভূমে পড়ে দুর্য্যোধন।
দেখি দেবগণ, চমৎকৃত মন,
ভীম করে আস্ফালন॥

কাশীরাম দাস।

ডি আলেমবার্ট।

ডি আলেমবার্ট ১৭১২ খৃষ্টাব্দে পারিস নগরে জন্মগ্রহণ করেন। যখন সদ্যোজাত শিশু, তখন পারিস নগরের এক বৃদ্ধা রমণী ইহাঁকে একটী ধর্ম্ম মন্দিরের প্রাঙ্গনে প্রাপ্ত হন। বৃদ্ধা শিশুটীকে পাইয়া পরম রত্ন জ্ঞানে আপন কুটীরে লইয়া

গেলেন এবং অতি যত্নের সহিত লালন পালন করিতে লাগিলেন। শিশুটীকে পাইবার দুই একদিন পরেই জনৈক সম্ভ্রান্ত লোক বৃদ্ধার কুটীরে উপস্থিত হইলেন। ভদ্রলোকটী বৃদ্ধাকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিবার পর শিশুটীর বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। বৃদ্ধা কোথায় কি প্রকারে শিশুকে পাইয়াছিলেন, সমস্ত বর্ণনা করিলেন। তখন সেই ভদ্রলোক বৃদ্ধার দয়ার প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "তুমি এই অনাথ শিশুকে আপন বুকে স্থান দিয়া সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্রী হইয়াছ। বেশ, তুমি শিশুটীকে লালন পালন কর, খরচ পত্রের জন্য তোমার কোন ভাবনা নাই, আমিই সমস্ত যোগাইব।" বৃদ্ধা বাঁচিয়া গেলেন এবং দুহাত তুলিয়া ভদ্রলোকটীকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। তদবধি সেই ভদ্রলোক শিশুর খরচ পত্র যোগাইয়া আপন বাক্য রক্ষা করিয়াছিলেন। শিশু বৃদ্ধার যত্নে ও সেই ভদ্রলোকের সাহায্যে ক্রমে ফরাশী দেশীয় লোকসমাজে একজন গণ্যমান্য লোক হইয়া উঠিলেন। সাহিত্য, বিজ্ঞান ও গণিত শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া ডি আলেমবার্ট ফরাশী দেশের গৌরব স্বরূপ হইয়াছিলেন। সুবিখ্যাত ফরাশী "এনসাইক্লোপিডিয়া" গ্রন্থাবলীর গণিতের অংশটী সমস্তই তাঁহাদ্বারাই লিখিত হয় এবং এই গ্রন্থাবলী সম্পাদন বিষয়ে তিনি ডিডিরোকে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। প্রুসিয়ার রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডেরিক ডি আলেমবার্টের পরম সুহৃৎ ছিলেন। তিনি তাঁহাকে বার্লিন নগরে রাখিবার জন্য অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু কেহই তাঁহাকে

বৃদ্ধার কুটীর হইতে স্থানান্তরিত করিতে পারেন নাই। রুসিয়ার রাজ্ঞী ক্যাথারিন্ তাঁহাকে আপন পুত্রের শিক্ষক নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া চিঠি লিখিলেও ডি আলেমবার্ট বলিয়াছিলেন, যে যত দিন জীবিত থাকিবেন, তিনি এই সামান্য কুটীর পরিত্যাগ করিয়া আর কোথাও যাইবেন না। ধন মান টাকাকড়ি লইয়া ডি আলেমবার্ট পারিস নগরে মহা সুখভোগে দিন কাটাইতে পারিতেন, যেরূপ আয়োজন থাকিলে জনসমাজে গণ্য মান্য হওয়া যায়, ডি আলেমবার্টের সেইরূপ বস্তুর কোন অভাব ছিল না। কিন্তু তাঁহার প্রাণ সেদিকে গেল না। তিনি মান ও সুখ্যাতি অপেক্ষা শান্তি ও স্বাধীনতাকে অধিক ভাল বাসিতেন। তিনি অনাথ হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, অনাথিনী দুঃখিনীর কোলে মানুষ হইয়াছিলেন এবং চিরকাল সেই দুঃখিনী পালনকর্ত্রীর কুটীরে থাকিয়া পরম প্রীতি লাভ করিতেন।

জন হাউয়ার্ডের বাল্যজীবন।

মহাত্মা জন হাউয়ার্ডের জন্মতিথি, এমন কি জন্মস্থান সম্বন্ধেও মতদ্বৈধ আছে। হেপওয়ার্থ ডিক্সন্ নামক এক ব্যক্তি এসম্বন্ধে একটী সুন্দর মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার কথার মর্ম্ম এই যে, জন হাউয়ার্ডের ন্যায় জনহিতৈষী মহাত্মাদের

খ্যাতি এবং প্রতিপত্তি কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে কি কালে আবদ্ধ থাকিতে পারেনা; তাঁহার ন্যায় মহাপুরুষদের গৌরব কোন জাতি-বিশেষের সম্পত্তি নহে, সমস্ত মনুষ্যজাতি সমানভাবে উহার সত্বাধিকারী; সুতরাং হাউয়ার্ডের জন্মতিথি ও জন্মস্থান বিষয়ে সন্দেহ থাকে থাকুক, সে সন্দেহ দূর করিতে গিয়া কাহারও ক্লেশ স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই।

হাউয়ার্ডের জন্মের পরে একটী কন্যা প্রসব করিয়া অতি অল্পকালের মধ্যেই হাউয়ার্ডের জননী পরলোক গমন করেন। হাউয়ার্ডের পিতা দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিলেন বটে, কিন্তু পরিণয়ের কয়েক মাস পরেই তাঁহার দ্বিতীয়া ভার্য্যা নিঃসন্তান অবস্থায় ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

হাউয়ার্ডের পঞ্চদশ কি ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটে। উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত না হইলে হাউয়ার্ড পৈতৃক সম্পত্তির কর্ত্তৃত্বভার পাইবেননা, পিতার এইরূপ আদেশ ছিল বটে, কিন্তু হাউয়ার্ডের বিচারশক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি ও কার্য্য-দক্ষতার উপর তাঁহার পিতৃনিয়োজিত কর্ম্মকর্ত্তাদিগের দৃঢ় আস্থা ছিল। এইজন্য অপ্রাপ্তবয়স্ক জানিয়াও তাঁহারা নিঃশঙ্কচিত্তে তাঁহার হস্তে পৈতৃক সম্পত্তির সমস্ত কর্ত্তৃত্বভার অর্পণ করিলেন।

হাউয়ার্ড স্বহস্তে সমস্ত কার্য্যভার গ্রহণ করিবার পরেই পৈতৃক বাটীর জীর্ণসংস্কারকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। যে বিশ্বজনীন মানব-প্রেম প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় হাউয়ার্ডের হৃদয় গ্রাস

করিয়াছিল, সেই সর্ব্বজনীন প্রীতির দুই একটী স্ফুলিঙ্গ এই সময়েই দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। হাউয়ার্ডের পিতার একটী বৃদ্ধ ভৃত্য ছিল। বহুকাল হইতে এই ভৃত্য হাউয়ার্ডের পিতার মালীর কাজ করিত। পিতার মৃত্যুর পর যখন হাউয়ার্ড বিষয়ের কর্ত্তৃত্বভার পাইলেন, তখনও এই বৃদ্ধ ভৃত্য আপন কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল। তাহার দুরবস্থা দেখিয়া হাউয়ার্ড প্রাণে বড় ক্লেশ পাইতেন। যখনই বাগানের নিকট দিয়া রুটীওয়ালাদের গাড়ী চলিয়া যাইবার সময় হইত, তখনই তিনি প্রাচীরের বাহিরে যাইয়া রাস্তার নিকট দাঁড়াইয়া থাকিতেন এবং একখানি রুটী ক্রয় করিয়া বাগানের মধ্যে নিক্ষেপ করিতেন। পরে বাগানে প্রবেশ করিয়া হাসিতে হাসিতে বৃদ্ধ মালীকে বলিতেন, "মালি! ঐ শাকবনের মধ্যে খুঁজিয়া দেখ দেখি, তোমার পরিবারের জন্য কিছু পাও কিনা?"

বিষাদ।

দয়াময় বিধি! কিবা তব বিধি,
মানব বুঝিবে কিসে?—
সুন্দর ফণীরে ধরিলে আদরে,
শেষে জ্ব'লে মরে বিষে!

চাঁদিমার আলো আঁধারে মিশিয়ে,
অবনীর ম্লান মুখ,
সাধের কুসুম পড়েছে ঝরিয়ে,
লতিকার খালি বুক!
সোণার শিশুটী না তুলিতে কোলে,
পোড়া কাল কোথা ছিল,
মা'র বুকখানি আঁধার করিয়া
আগে তারে কোলে নিল!—
কেন দশ মাস এ ঘোর যাতনা—
কেন বা অসহ্য ব্যথা;
পীযূষ-পাদপে এ কি বিষফল,
লাভ মহা আকুলতা!
সে যদি চাহেনি মরতে থাকিতে,
গেছে যদি দেব-পুরে,
তবে কেন মা'র স্মৃতিপটে সদা
তারি ছবিখানী স্ফুরে?
"খেলিতে আসিয়া সোণার পুতলী
খেলিতে পেলেনা হায়।"
হেন পোড়া কথা, কেন আসে মনে
কেন বুক ফেটে যায়?

কাব্যকুসুমাঞ্জলি প্রভৃতি রচয়িত্রী
শ্রীমানকুমারী দাসী।
(বামাবোধিনী পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত।)

হাউয়ার্ডের প্রজাপালন।

কারামুক্ত হইয়া হাউয়ার্ড ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিলেন, এবং তাঁহার কারডিংটনস্থ উদ্যানে বাস করিতে লাগিলেন। কারডিংটন একটী ক্ষুদ্র গ্রাম। এই গ্রামে হাউয়ার্ডের কিছু ভূমি-সম্পত্তি ছিল। তাঁহার অধিকারস্থ প্রজাবর্গ নানা কারণবশতঃ অতিশয় শোচনীয় অবস্থায় জীবনযাপন করিতেছিল। দারিদ্র্যই তাহাদের সকল দুঃখের মূল। শুদ্ধ হাউয়ার্ডের প্রজাগণই যে দীন দরিদ্র ছিল এমন নয়, সমস্ত কারডিংটন গ্রামটীর অবস্থাই তখন অতীব হীন ও শোচনীয় ছিল। কারডিংটনের অবস্থা দেখিয়া হাউয়ার্ড আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; তিনি বদ্ধ-পরিকর হইয়া এই ক্ষুদ্র পল্লীর শ্রীবৃদ্ধিসাধনে রত হইলেন, পরোপকার ব্রতে সম্পূর্ণরূপে ব্রতী হইয়া দিন কাটাইতে লাগি-লেন। হাউয়ার্ড নিঃস্ব প্রজাদিগের বাসোপযোগী কতকগুলি পরিষ্কার কুটীর নির্ম্মাণ করাইলেন, এবং কুটীরবাসিগণের কৃষিকর্ম্মের সুবিধার জন্য যাহাতে প্রত্যেক কুটীরের নিকটে কিছু পরিমাণে কর্ষণোপযোগী ভূমি থাকে এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী তাঁহাকে এই কার্য্যে বিশেষ সাহায্য করিতে লাগিলেন। একবার বর্ষশেষে হাউয়ার্ড হিসাব করিয়া দেখিলেন বৎসরের খরচবাদে কিছু অর্থ উদ্বৃত্ত হইয়াছে।

তিনি সহধর্ম্মিণীকে বলিলেন, “এই অর্থ দ্বারা তুমি লণ্ডন নগরে বেড়াইতে যাইতে পার, অথবা তোমার ইচ্ছা হইলে ইহা অন্য কোনরূপ আ[illegible]দে ব্যয় করিতে পার।”

তাহাতে তাঁহার স্ত্রী হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন, “এই টাকায় কেমন সুন্দর একখানি কুটীর, নির্ম্মিত হইতে পারে।” হাউয়ার্ড সহধর্ম্মিণীর উত্তরে যারপর নাই আহ্লাদিত হইয়া সেই অর্থ দ্বারা সত্য সত্যই একখানা মনোহর কুটীর নির্ম্মাণ করাইলেন। আপন ভূমিতে এইরূপ দরিদ্রের বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া হাউয়ার্ড সর্ব্বদাই বিশেষ সাবধানতার সহিত প্রজা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। মিতাচারী, পরিশ্রমী লোকের দ্বারাই এই সকল কুটীর পূর্ণ হইতে লাগিল। হাউয়ার্ড ও তাঁহার পত্নী এই সকল দরিদ্র লোকের পিতৃমাতৃস্বরূপ হইয়া তাহাদিগকে উপযুক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া দিতেন। রোগশোকের সময়ে উভয়ে প্রত্যেকের বাটী যাইয়া রোগীর শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইতেন এবং শোকসন্তপ্তের শোকানল সান্ত্বনাবারি সিঞ্চন দ্বারা নির্ব্বাণ করিতেন। এই সকল দরিদ্র লোকদিগের পুত্র কন্যার শিক্ষার ভার হাউয়ার্ড স্বয়ংই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার এমন কঠিন নিয়ম ও শাসন ছিল যে, তাঁহার অধিকারস্থ নরনারীগণকে বাধ্য হইয়া সকল প্রকার নীতি-বিগর্হিত আমোদ প্রমোদ হইতে বিরত থাকিতে হইত। অথচ তাঁহার প্রজাগণ যাহাতে মনের সুখে বাস করিতে পারে তজ্জন্য তিনি নানারূপ নির্দ্দোষ আমোদের বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন। তাঁহার সারগর্ভ উপদেশ ও জীব-

নের সদ্দৃষ্টান্ত হইতে অশিক্ষিত প্রজাগণ পরিশ্রম ও মিতব্যয়িতার উপকারিতা শিক্ষা করিতে লাগিল। যাহাদের কার্য্যে ও জীবনে কোনরূপ শৃঙ্খলা ছিলনা, হাউয়া[illegible] সাধু দৃষ্টান্তে সেই সকল নিরক্ষর প্রজাগণ সচ্চরিত্র হইয়া দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহাদের কল্যাণসাধনের জন্য হাউয়ার্ড শারীরিক পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও কুণ্ঠিত হইতেন না; এক কথায় হাউয়ার্ডের জীবনের তেজঃ সূর্য্যালোকের ন্যায় কারডিংটনবাসী দরিদ্রপ্রজাগণের নানাবিধ কল্যাণসাধন করিতে লাগিল।

অভাব কি থাকে অপূরণ?

তুমি প্রভু, আমি দাস তব,
জীবন নিজস্ব মোর নয়;
যাহা আজ্ঞা শিরে ধরি লব,
তুমি জান কিসে ভাল হয়।
তুমি জান কবে, কোন স্থানে,
কোন কাজে আসিবে এ জন,
আর কেহ জানে বা না জানে,
তুমি জান মোর প্রয়োজন।

শক্তিময় তুমি মহারাজ,
ইচ্ছায় শাসিছ ভূমণ্ডল,
ছোট হাতে দেছ ছোটকাজ,
তার বুঝি প্রাণে দেছ বল।
জ্ঞান আঁখি সর্ব্বতঃ তোমার,
জাগরূক আছে অনুক্ষণ,
আমারি নয়নে অন্ধকার,
তাই মোর ব্যাকুলিত মন।
কাঁদি হেরি কার্য্য অগণন
শকতির অতীত আমার ;
মিছা চিন্তা,—আর কোনজন,
শক্তিমান্, পেয়েছ সে ভার।
আমা হ'তে যেই কাজ হয়,
তাহে ঢালি দেই তনু মন,
তোমার জগতে প্রেমময়,
অভাব কি থাকে অপূরণ ?

"আলো ও ছায়া" রচয়িত্রী

শ্রীকামিনী রায়, বি, এ,।

জর্জ্জ ওয়াসিংটনের অপক্ষপাতিত্ব।

বহুকাল পূর্ব্বে জর্জ্জ ওয়াসিংটন আমেরিকার যুক্তরাজ্যে প্রেসিডেণ্টের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, এবং ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তিনি একজন অসাধারণ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার প্রতিভা ও মনীষা, ধীরতা ও সাহসিকতা, কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও ন্যায়পরতা সম্বন্ধে বহু বিবরণ বর্ণিত আছে। তিনি কিরূপ অপক্ষপাতী ছিলেন, নিম্নলিখিত বৃত্তান্তটী পাঠ করিলে তাহা অবগত হওয়া যায়।

জর্জ্জ ওয়াসিংটনের জনৈক বন্ধু ছিলেন। ব্রিটেনের বিরুদ্ধে সমরকালে ইনি ওয়াসিংটনের দক্ষিণ হস্তের ন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন। যুদ্ধের অবসানে সর্ব্বদাই পরম সুহৃদের ন্যায় ইনি প্রেসিডেণ্টের সহিত ব্যবহার করিতেন। প্রত্যহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন, তাঁহার পারিবারিক সুখ দুঃখের তত্ত্ব লইতেন, এক কথায় ওয়াসিংটনকে সুখী করিবার জন্য তাঁহার বন্ধু আপনার সুখ, দুঃখ, অনায়াসে বিস্মৃত হইতে পারিতেন। ওয়াসিংটনের বন্ধু বিবিধসদ্গুণালঙ্কৃত ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ব্যবসা-বুদ্ধি তাঁহার ছিল না বলিলেই চলে। ওয়াসিংটনের অধীনে একটী কর্ম্মখালি হয়।

তাঁহার বন্ধু এই কর্ম্মের প্রার্থী হন। অপর একব্যক্তিও উক্ত কর্ম্মের প্রার্থী হইয়া ওয়াসিংটনের নিকট এক আবেদন করেন।

ইনি ওয়াসিংটনের একজন পরম শত্রু ছিলেন; অনেক বার রাজনৈতিক জাল বিস্তার করিয়া ইনি তাহাতে ওয়াসিংটনকে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। (অনেকেই মনে করিয়াছিল, ওয়াসিংটন তাঁহার প্রিয় সুহৃৎকেই সেই কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন, দ্বিতীয় প্রার্থয়িতার পক্ষে সে কার্য্য পাইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। কিন্তু লোকের অনুমান অন্যথা হইল, ওয়াসিংটনের বন্ধু নিরাশ হইলেন, ওয়াসিংটনের পরম শত্রু তাঁহার অনুগ্রহ-ভাজন হইল। ওয়াসিংটনের অপর এক বন্ধু এই উপলক্ষে প্রসঙ্গক্রমে একদিন ওয়াসিংটনকে বলিয়াছিলেন, "কাজটা কি ভাল হইয়াছে?" ওয়াসিংটন গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, "আমার বন্ধুর অনেক সদ্গুণ আছে তাহা আমার অবিদিত নাই; কিন্তু বিষয়-বুদ্ধি তাঁহার বড়ই অল্প; আমার গৃহে, আমার পরিবারে তিনি চিরদিনই সমাদৃত হইবেন; আমার ব্যক্তিগত জীবনের উপর তাঁহার প্রভুত্ব চিরকালই অক্ষুণ্ণ থাকিবে; কিন্তু সাধারণের শুভাশুভ যাহার উপর নির্ভর করে এরূপ কোনও কার্য্যে আমি তাঁহাকে নিযুক্ত করিতে পারি না। আমার শত্রু বলিয়া যাঁহাকে উল্লেখ করিতেছেন, তাঁহার বিষয়-বুদ্ধি, ব্যবসা-জ্ঞান অসাধারণ। অতএব আমার প্রতি তাঁহার এবং তাঁহার প্রতি আমার যে ভাব থাকুক, তদ্দ্বারা একার্য্যে কাহারও পরিচালিত হওয়া সঙ্গত নহে। এখানে আমি জর্জ্জ ওয়াসিংটন

নহি, এখানে আমি আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যের প্রেসিডেণ্ট হইয়াই কার্য্য করিয়াছি। জর্জ্জ ওয়াসিংটনরূপে আমি আমার বন্ধুকে সুখী করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে পারি; কিন্তু প্রেসিডেণ্টরূপে আমি তাঁহার জন্য কিছুই করিতে সমর্থ নহি।”

নিশীথ-কল্পনা।

সুবিমল শশধর কিবা শোভা ধরে!
চারিদিকে অগণিত তারকা বিহরে;
যেন কোটি হীরাখণ্ড করে ঝলমল,
তার মাঝে বিরাজিত কনক-মণ্ডল!
চকোর চকোরী সুখী নিরখিয়া শশী,
সুধাপানে ক্ষুধা হরে, তরু’পরে বসি।
সরোবরে বিকসিত কুমুদিনীকুল,
কিবা রূপ মনোহর নাহি সমতুল!
রাজহংস-অত্যাচারে নাহি আর ভয়,
মৃণাল-আসনে বসি গর্ব্ব অতিশয়!
কাল পেয়ে হয়েছে কি এত অহঙ্কার?
দিবাগমে পুনঃ তব হবে অন্ধকার!
অতএব বাড়াবাড়ি কর কার কাছে?
সময়ের গতি প্রতি বিশ্বাস কি আছে?

যার তেজে এত তেজ করি নিরীক্ষণ,
সেই শশী হইতেছে ম্লান প্রতিক্ষণ।
জ্বলিছে খদ্যোতকুল তরু শির'পরে ;
কামিনী কুন্তলে যথা মুক্তাহার পরে ;
কেহ কেহ শূন্যে উঠে যেন পথ হারা,
বোধ হয় তারাগণে ব্যঙ্গ করে তারা।
এই আছে, এই নাই, এই আর বার,
মানবের মনে যথা আশার সঞ্চার!
কোথা বা বাঁধিয়া ঝাঁক করে ঝক্‌মক্‌,
মিলিত হয়েছে যেন সহস্র হীরক ;
নবদূর্ব্বাদল-ক্ষেত্রে কখন বিরাজ,
ভূপতি-আসনে যথা কনকের কাজ।
স্থিরতার অধিকার হয়েছে এক্ষণে,
নিদ্রায় চেতনহীন পশুপক্ষিগণে,
নাহি ভৃঙ্গ-গুঞ্জরণ, পিক-কুহুস্বর,
মূর্চ্ছ'-প্রায় * স্থিরকায় নিদ্রা যায় নর ;
কেবল পেচকরাজ সহ নিশাচর
গালি দেয় ক্রোধভরে হেরি নিশাকর ;
আঁধারে পুলক যার, আলোকেতে রোষ,
তার কভু হয় শশিকিরণে সন্তোষ ?
এইরূপ নানা শোভা রজনী সময়
নিরখি মানস মম মুগ্ধ অতিশয়।

* মূর্চ্ছ'প্রায়—মূর্চ্ছি'তের প্রায়।

শীতল-শর্ব্বরী-গুণে সুখী সর্ব্বজন,
অসুখে কাটায় শুধু দুষ্ট পাপিগণ।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
(পরিবর্ত্তিত।)

সক্রেটিস্।

খৃষ্টের জন্মের প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে গ্রীশে ও ভারতবর্ষে দুই মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের একের জন্মস্থান অপরের জন্মভূমি হইতে বহুদূরবর্ত্তী; কিন্তু আবির্ভাবকালে তাঁহারা পরস্পরের সমসাময়িক। সক্রেটিস ও বুদ্ধ উভয়েই মানবজাতির শিক্ষক, উভয়েই মানবকে অজ্ঞানতা হইতে মুক্ত করিবার জন্য স্বীয় স্বীয় ভাবে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। গ্রীশদেশের অন্তঃপাতী এথিনি নগরের উপকণ্ঠে খৃষ্টাব্দের ৪৭০ বৎসর পূর্ব্বে মহাত্মা সক্রেটিস জন্মগ্রহণ করেন। সক্রেটিসের পিতা একজন প্রস্তরখোদক ছিলেন; প্রস্তরের প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করাই তাঁহার জীবিকানির্ব্বাহের উপায় ছিল। তাঁহার মাতা ধাত্রীর কর্ম্ম করিতেন। সক্রেটিসও প্রথমে পৈতৃক ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সাংসারিক অবস্থা কখনও সচ্ছল ছিল না। সক্রেটিস জেণ্টিপিনাম্নী এক নারীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি অত্যন্ত ক্রোধপরায়ণা ও কলহপ্রিয়া ছিলেন। কিন্তু ইঁহার দুর্ব্যবহারে সক্রেটিসের চিত্তের

স্থৈর্য্য ও প্রসন্নতা কস্মিনকালেও নষ্ট হয় নাই। সক্রেটিস্ সামান্য পদাতিকের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া তিনবার দূরদেশে যুদ্ধ-যাত্রা করিয়াছিলেন। ক্ষুৎপিপাসায় তিনি কখনও কাতর হইতেন না; তাঁহার ন্যায় কষ্টসহিষ্ণু লোক অতি অল্পই ছিল। তিনি সামান্য বেশে সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতেন; কি শীত, কি. গ্রীষ্ম, কোন সময়েই পাদুকা ব্যবহার করিতেন না। এক প্রকার মোটা কাপড় তিনি সর্ব্বদা পরিধান করিতেন এবং তাঁহার আহারও যৎসামান্য ও পরিমিত ছিল।

সক্রেটিস যদিও খোদকের কর্ম্ম করিতেন, তথাপি তাঁহার মনের গতি অন্যদিকে ছিল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জ্ঞানার্জ্জন-স্পৃহা বলবতী হইয়া উঠিতে লাগিল। তিনি মান, সম্ভ্রম, খ্যাতি ও প্রতিপত্তি চাহিলেন না, দরিদ্র থাকিয়া চিরকাল জ্ঞানোপার্জ্জন করিবেন, সত্যান্বেষণ করিবেন, ইহাই তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইল। তৎকালে এথিনি নগরে যে সকল দার্শনিক পণ্ডিত আপনাদের মত প্রচার করিতেছিলেন সক্রেটিস তাঁহাদের নিকট গমন করিয়া, অতি শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করিতেন, এবং তৎকালপ্রচলিত বহুবিধ গ্রন্থও তিনি পাঠ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার জ্ঞান-পিপাসা মিটিল না। তিনি স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন এবং সত্যান্বেষণের এক নূতন বৈজ্ঞানিক প্রণালী নিরূপণ করিলেন। কালক্রমে সক্রেটিস প্রকাশ্যভাবে এথিনীয় যুবকগণকে শিক্ষা ও উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার

পূর্ব্বে এথিনি নগরে যে সকল শিক্ষক ও অধ্যাপক ছিলেন, তাঁহারা বেতন-ভুক্ ছিলেন; সুতরাং ধনীর সন্তানগণকে শিক্ষা দেওয়াই তাঁহাদের প্রধান কার্য্য ছিল। সক্রেটিস এইরূপ কার্য্য অতি ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ করিয়া বিনা বেতনে সর্ব্বসাধারণকে উপদেশ প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার কোন নির্দ্দিষ্ট শিক্ষালয় ছিল না; কি রাজপথ, কি বাণিজ্যাগার, কি শৌণ্ডিকাপণ সক্রেটিসের সর্ব্বত্রই গতিবিধি ছিল। এই সকল স্থানেই তিনি শিষ্যগণপরিবৃত হইয়া উপদেশ প্রদান করিতেন। তিনি যখন যেখানে গমন করিতেন শিষ্যেরা সর্ব্বদাই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতেন। কিন্তু বহুলোকের শিক্ষক ও উপদেশক বলিয়া সক্রেটিসের মনে কখনও জ্ঞানাভিমান স্থান পাইত না; তিনি আপনাকে অতি হীন ও অজ্ঞ বলিয়াই জানিতেন। জ্ঞানী অথবা উপদেষ্টা বলিয়া তিনি কখনও আত্মপরিচয় দিতেন না। তিনি কিছুই জানেন না ইহাই তাঁহার ধারণা ছিল; তিনি কিছুই বুঝেন না ইহাই তাঁহার বিশ্বাস ছিল। সক্রেটিস কখনও কোনও বিষয় লিখিয়া আপনার মত ব্যক্ত করেন নাই। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে কিছু জানিতে হইলে তাঁহার শিষ্য প্লেটো ও জেনোফনের গ্রন্থাদিই পাঠ করিতে হয়। এই শিষ্যদ্বয়ই সক্রেটিসের জীবনের অপূর্ব্ব রত্ন সকল রক্ষা করিয়া আশ্চর্য্য গুরুভক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়া লোকেরা সত্যলাভ করিবে ইহাই সক্রেটিসের মত ছিল। যথার্থ জ্ঞানের উদয় না হইলে যে

প্রকৃত নৈতিকজীবন গঠন হইতে পারে না, ইহাও তিনি বিশ্বাস করিতেন। এই সকল মতের জন্যই তিনি দেশের লোকের শত্রু হইয়া উঠিলেন। তাঁহার শত্রু-বৃদ্ধির আরও একটী গুরুতর কারণ ছিল। তাঁহার প্রখর বুদ্ধি, অতুল তর্কশক্তি ও গভীর জ্ঞানের নিকট এথিনীয় পণ্ডিতগণকে পরাভব মানিতে হইত। তিনি দার্শনিকগণকে তর্ক-যুদ্ধে পরাজয় করিয়া তাঁহাদের প্রচারিত ভ্রান্তিপূর্ণ মত সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া উড়াইয়া দিতেন। দেশের চিরপ্রচলিত সংস্কার ও প্রথার বিরুদ্ধে মত প্রচার করিয়া কোন নূতন মত প্রচলন করিতে গেলে যে সমাজের আপামর সাধারণ খড়্গহস্ত হইয়া উঠিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এথিনীয়গণ প্রচার করিতে লাগিল যে "সক্রেটিস নগরের নব্য সম্প্রদায়কে অসৎ উপদেশ দিতেছেন, নূতন মতের সৃষ্টি করিতেছেন, এবং গ্রাম্য দেবতাগণকে অমান্য করিয়া নাস্তিকতা বিস্তার করিতেছেন।" এইরূপে জনসাধারণ যখন সক্রেটিসের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়া উঠিল তখন অতি সামান্য এক ব্যক্তি অপর দুইজন লোকের পোষকতায় সক্রেটিসের নামে ধর্ম্মাধিকরণে এক অভিযোগ উপস্থিত করিল। সক্রেটিস নগরের দেবতাগণকে পূজা করেন না; তিনি যুবকগণকে কুপথগামী করিতেছেন। এইরূপ অপরাধে সক্রেটিস অভিযুক্ত হইলেন। এই অপরাধে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইবে শুনিয়া তাঁহার শিষ্যগণ যারপরনাই চিন্তিত হইলেন। তাঁহারা সক্রেটিসের পক্ষসমর্থনের জন্য উকিল নিযুক্ত করিতে চাহিলেন,

এবং অন্যান্য উপায়ে সক্রেটিসকে নির্দ্দোষ প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সক্রেটিস একটুকুও বিচলিত হইলেন না। তিনি কি করিলেন? তাঁহাকে এইভাবে বিপদ্‌গ্রস্ত করিয়া যখন তাঁহার শত্রুপক্ষীয়েরা চতুর্দ্দিকে আস্ফালন করিতে-ছিল, তাঁহার পরিণাম চিন্তা করিয়া যখন তাঁহার প্রিয় শিষ্যগণ ও ভক্তগণ গভীর দুঃখে নিমগ্ন হইয়াছিলেন, তখন সেই মহা-পুরুষ আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগের কথা শুনিয়া একবার-মাত্র ঈষৎ হাস্য করিয়া সম্পূর্ণরূপে নীরব হইলেন। তিনি বীরের ন্যায় বিচারকগণের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি আপন নির্দ্দোষতা প্রমাণ করিবার জন্য কোনও চেষ্টা করিলেন না; বিচারকদিগের কৃপার ভিখারী হইয়া স্বীয় জীবন রক্ষার জন্যও প্রার্থনা করিতে ঘৃণাবোধ করিলেন। তিনি এথিনীয়গণকে সম্বোধন করিয়া একটী সুদীর্ঘ সারগর্ভ বক্তৃতা করিলেন। সক্রেটিসের বক্তৃতা শেষ হইলে তাঁহার বিচারকদের মধ্যে অধিকাংশেই তাঁহাকে দোষী স্থির করিলেন। কিন্তু তাহারা সক্রেটিসের প্রতি এই একটু অনুগ্রহ প্রকাশ করিল যে, সক্রেটিসের প্রতি যে দণ্ড বিধান হইবে তিনি ইচ্ছা করিলে তৎপরিবর্ত্তে অন্য কোন উপযুক্ত দণ্ড গ্রহণ করিতে পারিবেন। সক্রেটিস এই দণ্ডাজ্ঞা শুনিয়া বিচারকগণকে কহিলেন, "আমি আপনাকে একবারও অপরাধী জ্ঞান করি না। বরং আমি যাহা করিয়াছি তজ্জন্য আমাকে পুরস্কার দেওয়াই তোমাদের উচিত। তবে নিয়মরক্ষার্থ আমার শিষ্য প্লেটো আমার জন্য কিছু

অর্থ দিতে প্রস্তুত আছেন।” এই কথা শুনিয়া বিচারকগণ ক্রোধে জ্বলিতে লাগিল, তাহারা তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ করিল।

প্রাণদণ্ডের আদেশের পর সক্রেটিস ত্রিশদিন কারারুদ্ধ ছিলেন। এই সময় তিনি শিষ্যগণের সহিত নানাবিষয়ে কথোপকথন করিতেন এবং তাহাদিগকে উপদেশ প্রদান করিতেন; কিন্তু এ অবস্থায় কেহ কখনও তাঁহার চিত্ত-চাঞ্চল্য দেখিতে পায় নাই। তাঁহার জনৈক শিষ্য তাঁহাকে পলায়ন করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া চোরের ন্যায় পলায়ন করিতে অস্বীকৃত হইলেন।

তাঁহার মৃত্যুদিন নিকটবর্ত্তী হইল। মৃত্যুর কিছুক্ষণ পূর্ব্বে আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে তিনি শিষ্যগণকে উপদেশ দিলেন। ইহাই তাঁহার শেষ উপদেশ। শিষ্যগণ তাঁহার মুখে এই শেষ কথা শুনিলেন। মহাপুরুষের হস্তে বিষের পাত্র প্রদত্ত হইল। তিনি আনায়াসে তাহা পান করিয়া মানবলীলা সংবরণ করিলেন। ধন্য মহাপুরুষ! সত্যের জন্য যাঁহারা প্রাণত্যাগ করেন তাঁহারাই প্রকৃত বীর; তাঁহাদের জীবন চিরদিনই দুর্ব্বল নরনারীগণের পক্ষে আলোকস্বরূপ, তাঁহাদের চরিত্র সর্ব্বত্রই পূজিত হইয়া থাকে।

বুদ্ধদেব।

খৃষ্টের পূর্ব্বে ষষ্ঠ শতাব্দীতে, অযোধ্যার উত্তরে, নেপালের দক্ষিণে, কপিলবস্তু নামে একটী রাজ্য ছিল। সেই রাজ্যের রাজা শুদ্ধোদন গৌতমকুলজ ও শাক্যবংশীয় ছিলেন। তিনি রাজা সুপ্রবুদ্ধের কন্যা মায়াদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব তাঁহাদিগেরই সন্তান। কুল ও বংশের নাম হইতে বুদ্ধ শাক্য ও গৌতম নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বুদ্ধের জন্মের সপ্তদিবস পরে তাঁহার মাতা মায়াদেবীর মৃত্যু হয়। মাতার মৃত্যুর পর বুদ্ধের প্রতিপালনের ভার তাঁহার মাতৃস্বসা গৌতমীর উপর অর্পিত হইল। গৌতমী রাজার দ্বিতীয়া ভার্য্যা ছিলেন। শাক্য-সিংহ বিমাতার অপরিসীম স্নেহে ও আন্তরিক যত্নে প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন।

কালক্রমে রাজকুমারের বিদ্যারম্ভ-কাল উপস্থিত হইল। রাজা শুদ্ধোদন সুসময়ে উপযুক্ত শিক্ষকের হস্তে পুত্রের শিক্ষাভার অর্পণ করিলেন। কুমার অসাধারণ মেধাবী ছিলেন, বিশেষতঃ বাল-সুলভ চপলতা তাঁহাতে একবারেই ছিল না; সুতরাং অতি অল্প দিনেই তিনি নানা বিদ্যায় আশাতিরিক্ত উন্নতি লাভ করি-লেন। বাল্যকাল হইতেই রাজকুমার অতিশয় চিন্তাশীল ছিলেন এবং সর্ব্বদা নির্জ্জনে বসিয়া চিন্তা করিতে ভাল বাসিতেন।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য ও চিন্তাশীলতা আরও বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। নগরের কোলাহল ছাড়িয়া তিনি নির্জ্জন কাননে ছুটিয়া যাইতেন; নগরের কৃত্রিম শোভা দর্শনে তাঁহার চিত্ত কখনও বিমোহিত হইত না; প্রকৃতির সুস্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য-সাগরে নিমগ্ন হইয়া তিনি আত্মহারা হইতেন। রাজা শুদ্ধোদন পুত্রের এইরূপ চিন্তাশীলতা ও অনাসক্তি দেখিয়া বড়ই চিন্তিত হইলেন এবং গোপানাম্নী পরমা সুন্দরী, শান্তশীলা, বিবিধ সদ্গুণসম্পন্না, সদ্বংশসম্ভূতা এক কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিলেন। বিবাহের পর রাজকুমার পরম সুখে কালযাপন করিতেছিলেন। সুশীলা গোপার ঐকান্তিক অনুরাগ ও শ্রদ্ধা-পূর্ণ সেবা শুশ্রূষায় তাঁহার চিত্ত কিছুকালের জন্য বিমুগ্ধ হইয়াছিল।

কিছুদিন পরে রাজকুমারের মনে প্রমোদোদ্যানে গমন করিবার অভিলাষ জন্মিল। তদনুসারে তিনি প্রমোদোদ্যানে যাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। সারথি রথ প্রস্তুত করিল। রাজকুমার বহুজনসমভিব্যাহারে নগরের পূর্ব্ব তোরণ দিয়া প্রমদোদ্যানে গমন করিতেছেন, এমত সময়ে পথিমধ্যে শীর্ণকায়, লোলিতচর্ম্ম, চলিতে অসক্ত এক বৃদ্ধকে দেখিতে পাইলেন। ঘটনাক্রমে বৃদ্ধের তাদৃশ বার্দ্ধক্য-ক্লেশ দেখিয়া রাজকুমার ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সারথি, এই খর্ব্বাকার দুর্ব্বল মনুষ্য কে?" সারথি উত্তর করিল, "রাজকুমার! এই ব্যক্তি জরাগ্রস্ত; ইহার এখন চলিবার শক্তি নাই, কার্য্য করিবারও

ক্ষমতা নাই, নিতান্ত অসহায় হইয়া পড়িয়াছে। বার্দ্ধক্যে সকলকেই এই দশা প্রাপ্ত হইতে হয়।" ইহা শুনিয়া রাজকুমার বলিলেন, "আমরা কি মূর্খ, যৌবনগর্ব্বে মত্ত হইয়া আমরা এক বারও এ দেহের পরিণাম চিন্তা করিয়া দেখি না।" এই বলিয়া চিন্তাযুক্ত হইয়া রাজকুমার গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

আর একদিন কুমার নগরের দক্ষিণ তোরণ দিয়া প্রমোদ-কাননে গমন করিতেছিলেন, পথিমধ্যে অকস্মাৎ এক বিবর্ণ-শরীর, বিকলেন্দ্রিয়, মুমূর্ষু লোকের শরীর তাঁহার নয়নগোচর হইল। তিনি সারথিকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, ঐ লোকের অন্তিম কাল উপস্থিত। সেদিনও চিন্তামগ্ন হৃদয়ে পুনরায় গৃহে আসিলেন। আর একদিন পশ্চিম তোরণ দিয়া যাইতেছেন, এমত সময় সম্মুখে একটী মৃতদেহ দর্শন করিয়া সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সারথি, সম্মুখে এ কি দেখি-তেছি?" সারথি বিনীতভাবে উত্তর করিল, "দেব, এটী একটী শব; মৃত্যুর পর দেহের দশা এইরূপই হইয়া থাকে।" এই কথা শুনিয়া রাজকুমার বিষণ্ণমনে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। অবশেষে একদা উত্তর তোরণ দিয়া প্রমোদকাননে গমন করিতেছিলেন। সে দিন এক কাষায়-বস্ত্রপরিহিত, শান্ত, গাম্ভীর্য্যপূর্ণ, তেজস্বী পুরুষকে দর্শন করিয়া রাজকুমার সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সারথি, এই পুরুষশ্রেষ্ঠ কে? ইঁহার সৌম্যমূর্ত্তি, নয়ন-জ্যোতিঃ, এবং সহজ অথচ মনোমুগ্ধকর প্রশান্ত ভাব দেখিয়া আমার প্রাণ যে উঁহাতে আকৃষ্ট হইতেছে। তুমি

ত্বরায় আমাকে ইঁহার বিবরণ জ্ঞাত কর।” সারথি কহিল, “দেব, ইনি সংযতচিত্ত, নির্ম্মলস্বভাব, সংসার-বন্ধনমুক্ত পুরুষ; ইঁহার সকল বাসনার নির্ব্বাণ হইয়াছে, সকল কামনার তৃপ্তিসাধন হইয়াছে, এখন জীবের সুখেই ইঁহার সুখ, জীবের দুঃখেই ইঁহার দুঃখ।” এই ভিক্ষু যোগীপুরুষের প্রশান্ত ভাব দেখিয়াই শাক্য-সিংহের স্বাভাবিক বৈরাগ্যপ্রবণ হৃদয়ে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণের সঙ্কল্প জন্মিল। একদিন নিশীথে পিতা, প্রিয়তমা পত্নী গোপা, সদ্য-জাত শিশু রাহুল, আত্মীয়স্বজন ও রাজভবন পরিত্যাগপূর্ব্বক শাক্যসিংহ ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। প্রথমে বৈশালি দেশে যাইয়া এক প্রসিদ্ধ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। তথায় কিছুকাল শিক্ষালাভ করিয়া মগধের রাজধানী রাজগৃহে আর এক ব্রাহ্মণের শিষ্য হইলেন। ইঁহার নিকট জ্ঞানলাভ করিয়াও বুদ্ধের জ্ঞান-পিপাসা মিটিল না। তিনি যে তত্ত্বের প্রয়াসী, সে তত্ত্ব লাভ হইল না। তিনি এস্থানও পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন এবং উরুবিল্ব গ্রামের নিকট একটী নির্জ্জন স্থানে কঠোর সাধনায় নিযুক্ত হইলেন। শরীর মন সমর্পণ করিয়া, ক্ষুধা নিদ্রা বিস্মৃত হইয়া, শীত গ্রীষ্ম অগ্রাহ্য করিয়া রাজকুমার বুদ্ধ ছয় বৎসরকাল মহা তপস্যায় অতিবাহিত করিলেন।

এই ছয় বৎসর মধ্যে বুদ্ধদেব একদিনের জন্যও আপনার লক্ষ্য ভিন্ন অন্য কোন দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন নাই, আপনার চিন্ত্যমান বিষয় ভিন্ন অন্য কিছু চিন্তা করেন নাই; তিনি

নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ শবের ন্যায় একাসনে মহাধ্যানে নিমগ্ন হইয়া এই দীর্ঘকাল কাটাইয়াছিলেন। তাঁহার শরীরের শোণিত শুষ্ক, নয়ন কোটরস্থ এবং অস্থি সকল গণনার যোগ্য হইয়া পড়িয়াছিল। "আমার শরীর শুষ্ক হউক, আমার অস্থিমাংস লীন হউক, নির্ব্বাণ প্রাপ্ত না হইয়া এ আসন পরিত্যাগ করিব না," শাক্যসিংহের এই মহাসঙ্কল্প তিনি বর্ণে বর্ণে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। তিনি এতই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তিনি জীবিত কি মৃত বহুকষ্টে তাহা অনুভব করা যাইত। এত কৃচ্ছ্র সাধনেও যখন তাঁহার প্রাণের বস্তু মিলিল না, শরীরপাত করিয়াও যখন তাঁহার জীবনের শান্তিলাভ হইল না, তখন তিনি যোগাসন পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং এই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে ধীরে ধীরে বহুকষ্টে অঙ্গে ভর করিয়া নৈরঞ্জনা নদীতীরে গমন করিলেন। ছয় বৎসর পরে স্নান করিয়া শরীর মন স্নিগ্ধ বোধ করিতে লাগিলেন। ছয় বৎসরকাল যে গৈরিক বসন পরিধান করিয়াছিলেন, সেই জীর্ণ বস্ত্রখানি পরিত্যাগ করিয়া তীরস্থ শ্মশান হইতে এক শবের বস্ত্র ধৌত করিয়া পরিধান করিলেন। এই সময় সুজাতা নাম্নী এক রমণী পায়সান্ন দিয়া বুদ্ধের প্রাণরক্ষা করিলেন। সুজাতার এই মিষ্টান্নভোজন করিয়াই বুদ্ধ বোধিপ্রাপ্ত হইলেন। কৃচ্ছ্র সাধনের অসারতা ও ভোগবিলাসের নিকৃষ্টতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া বোধিসত্ত্ব এই উভয় পথের মধ্যবর্ত্তী কর্ত্তব্যের পথ অবলম্বন করিলেন। কঠোর নিয়মাদি পরিত্যাগ করিয়া সিদ্ধার্থ আপনার কর্ত্তব্য সাধন করিতে

প্রবৃত্ত হইলেন দেখিয়া, তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু তিনি তাহাতে বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ না হইয়া সাধনায় নিযুক্ত রহিলেন। বোধিদ্রুম তলে একস্থানপূর্ব্বক বহু তপস্যার পর, ৩৬ বৎসর বয়সে সিদ্ধার্থ নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করিয়া, প্রচারে বহির্গত হইলেন। বুদ্ধদেব ৪৪ বৎসরকাল ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে, "বাসনা ও অজ্ঞানতাই জীবের সকল দুঃখের মূল" এই তত্ত্ব প্রচার করিয়া বেড়াইলেন। অবশেষে অশীতি-বৎসর বয়ঃক্রমকালে, বৈশালীর নিকটবর্ত্তী পাওয়া গ্রামস্থ চণ্ডনামক এক তাম্রকারের অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য তাহার ভবনে শুষ্ক শূকরমাংস ভক্ষণ করিয়া, বুদ্ধের উদরে ভয়ানক যন্ত্রণা উপস্থিত হইল, এবং তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিল।

মৃত্যুর পূর্ব্বে বুদ্ধ আনন্দ নামক এক প্রিয় শিষ্যকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ, চণ্ডের গৃহে আহার করিয়া আমার জীবন গেল, এ কথা শুনিলে চণ্ডের ক্লেশের সীমা থাকিবে না; তুমি তাহাকে বলিবে যে সুজাতার অন্ন গ্রহণ করিয়া যেমন আমি বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি, চণ্ডের অন্ন ভোজন করিয়াও তেমনি এ সংসার হইতে পরিত্রাণ লাভ করিলাম। ইঁহারা উভয়েই আমার প্রকৃত বন্ধু।"

ধন্য বুদ্ধদেব! ধন্য পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ! শাক্যসিংহের প্রভাব কেবল ভারতে নিবদ্ধ নহে; উত্তরে তিব্বৎ, পূর্ব্বে চীন, দক্ষিণে সিংহল এবং পশ্চিমে ইউরোপ ও আমেরিকা পর্য্যন্ত

তাঁহার জীবনের শক্তি বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। বুদ্ধের নীতি, বুদ্ধের তত্ত্বজ্ঞান এবং বুদ্ধের অপূর্ব্ব পবিত্র জীবন এখন মনুষ্য-জাতির সাধারণ সম্পত্তি হইয়াছে। ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্ম হীন-প্রভ হইলেও, অন্যান্য দেশে এই ধর্ম্ম অনেকেই অবলম্বন করিয়াছে, এবং জগতে এক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী লোকের সংখ্যা যত, হিন্দু বা খ্রীষ্টীয়, য়িহুদি বা মহম্মদীয় অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বী-দিগের সংখ্যা তত নহে।

শ্রীচৈতন্যের শৈশব।

এই মত দিনে দিনে শচীর কুমার।
বাড়য়ে শরীর খানি অমিয়ার ধার * ॥
কি দিব উপমা কিছু না দিলে সে নারি।
খল্ বল্ করে প্রাণ না কহিলে মরি ॥
নিতি † ষোলকলাপূর্ণ ইন্দু মুখচন্দ্র।
সাধে দেখিবারে ধায় জনমের অন্ধ ॥
আবেশ অধরে আধ মুচকি হাসিতে।
অমিয়া সাগর যেন হিল্লোল সহিতে ॥

* ধারা। † নিত্য।

শচী পুণ্যবতী জগন্নাথ ভাগ্যবান্ ।
সাদরে নিরখে দোঁহে পুত্রের বয়ান ॥
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাঁদে ক্ষণে খটিকরে * ।
ক্ষণে কোলে ক্ষণে দোলে হিয়ার উপরে ॥
শচী উরঃস্থলে দুই চরণ রাখিয়া ।
দোলে যেন সোণার লতিকা বায়ু পাঞা ॥
অতি দীর্ঘ নয়ন সুন্দর অট্ট হাসি ।
অধরে অমিয়া যেন ঢালিছেন শশী ॥
নাসিকা শুকের ওষ্ঠ জিনি মনোহর ।
গণ্ডযুগ জ্যোতির্ম্ময় গটল সোসর † ॥
এক দুই তিন চারি পাঁচ ছয় মাসে ।
নাম করণ অন্নপ্রাসন দিবসে ॥
পুত্র মহোৎসব করে মিশ্র পুরন্দর ।
অলঙ্কারে ভূষিল সোণার কলেবর ॥

লোচন দাস ।

এই মত দিনে দিনে শ্রীশচীনন্দন ।
হাটিয়া করয়ে সদা অঙ্গণে ভ্রমণ ॥
আজানুলম্বিত ভুজ অরুণ অধর ।
সকল লক্ষণযুক্ত বক্ষ পরিসর ॥
সহজে অরুণ দেহ গৌর মনোহর ।
বিশেষ অঙ্গুলি কর চরণ সুন্দর ॥

---

* আবদার । † সদৃশ ।

বালক স্বভাবে গোরা যবে চলি যায়।
রক্ত পড়ে হেন দেখি মায়ে ত্রাস পায়॥
দেখি শচী জগন্নাথ বড়ই বিস্মিত।
নির্ধন তথাপি দোঁহে মহা আনন্দিত॥
কানাকানি করে দোঁহে নির্জ্জনে বসিয়া;
কোন মহাপুরুষ বা জন্মিল আসিয়া॥
এমন শিশুর রীত কভু নাহি শুনি।
নিরবধি নাচে হাসে শুনি হরিধ্বনি॥
তাবৎ ক্রন্দন করে প্রবোধ না মানে।
বড় করি হরিধ্বনি যাবৎ না শুনে॥
ঊষাকাল হইলে যতেক নারীগণ।
বালক বেড়িয়ে সবে করে সংকীর্ত্তন॥
হরি বলি নারীগণে দেই করতালি।
নাচে গৌর সুন্দর বালক কুতূহলী *॥
হেন অঙ্গভঙ্গী করি নাচে গৌরচন্দ্র।
দেখিয়া সবার হয় অতুল আনন্দ॥
নিরবধি ধায় শিশু কি ঘর বাহিরে।
পরম চঞ্চল কেহ ধরিতে না পারে॥
একেশ্বর † বাড়ীর বাহিরে কভু যায়;
খই কলা সন্দেশ যা দেখে তাই চায়॥
দেখিয়া গোরার রূপ পরম মোহন।
যে জন না চিনে সেহ দেয় ততক্ষণ॥

* আনন্দিত।
† একাকী।

সবেই সন্দেশ কলা দেহেন গোরারে।
পাইয়া সন্তোষ শিশু আসিলেন ঘরে॥
যে সকল স্ত্রীগণে গায়েন হরিনাম।
তা সবারে আনি সব করেন প্রদান॥
বালকের বুদ্ধি দেখি হাসে সর্ব্বজন।
হাততালি দিয়া হরি বলে অনুক্ষণ॥

শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর।

প্রাণিতত্ত্ব।

অবনীমণ্ডলে যতপ্রকার পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা তৎসমুদায়কে প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক ভাষানুসারে তাহাদের এক একটী বিভাগ এক একটী 'জগৎ' নামে অভিহিত। মনুষ্য ও সমস্ত ইতর প্রাণীদিগকে লইয়া "জীব-জগতের" সৃষ্টি হইয়াছে; বৃক্ষ লতা প্রভৃতি উদ্ভিদ-দিগকে লইয়া যে বিভাগটি হইয়াছে তাহার নাম 'উদ্ভিদ্-জগৎ'; চন্দ্র, সূর্য্য, নদী, পর্ব্বত প্রভৃতি অন্যান্য পদার্থনিচয় 'জড়-জগতের' অন্তর্গত। জড়পদার্থসমূহের সম্বন্ধে অবগত হইতে হইলে যেমন প্রকৃতি-বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিতে হয়, বৃক্ষলতাদির উৎপত্তি ও বৃদ্ধি সম্বন্ধে অবগত হইতে হইলে যেরূপ উদ্ভিদ্-

তত্ত্ব আলোচনা করা আবশ্যক, জীবজন্তুদিগের বিষয় জানিতে হইলেও সেইরূপ জীব-তত্ত্বের আলোচনা একান্ত প্রয়োজনীয়। মনুষ্য প্রখর বুদ্ধি-প্রভাবে প্রকৃতির গূঢ় তত্ত্ব সকল প্রকাশ করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তার মহিমা প্রচার করিতেছে। যে জ্ঞানবলে মানবগণ চঞ্চলা সৌদামিনীকে আজ্ঞাবহ করিয়া জগতের বিবিধ কল্যাণ সাধন করিতেছে, যে বুদ্ধি-কৌশলে মনুষ্যেরা উদ্ভিদ-দিগের গতি ও বোধশক্তি নির্ণয় করিতে সমর্থ হইতেছে, আবার সেই বুদ্ধি-প্রভাবেই তাহারা প্রাণিতত্ত্বালোচনার সৌকার্য্যার্থে ভিন্ন ভিন্ন জীবজন্তুদিগের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ ও শৃঙ্খলা সংস্থাপন করিয়া বিজ্ঞানের উন্নতিপক্ষে বিশেষ সুবিধা করিয়াছে।

বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে 'প্রাণিজগৎ' প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যাহাদের অস্থি, রক্ত ও মেরুদণ্ড আছে তাহারা "মেরুদণ্ড-বিশিষ্ট জীব" নামে অভিহিত; তদ্ভিন্ন অন্যান্য জীব সকল "মেরুদণ্ড-বিহীন জীব" বলিয়াই আখ্যাত হইয়া থাকে।

প্রথমতঃ "মেরুদণ্ড-বিশিষ্ট জীব"। ইহারা আবার চারিটী শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা, স্তন্যপায়ী, পক্ষিজাতীয়, মৎস্যজাতীয় এবং সরীসৃপ। যে সকল জীব পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া কিছুদিন পর্য্যন্ত মাতৃস্তন্য পান করিয়া জীবনধারণ করে তাহারা স্তন্য-পায়ী। মানুষ, বানর, বাদুড়, সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, কেঙ্গেরু, বিড়াল, কুক্কুর, হস্তি, অশ্ব, তিমি প্রভৃতি জীবসকল স্তন্য-পায়িশ্রেণীভুক্ত। কুম্ভীর, কচ্ছপ, সর্প, গোসাপ, টিকটিকি,

গিরগিটি, ভেক প্রভৃতি জন্তুকে সরীসৃপ বলে। দ্বিতীয়তঃ 'মেরুদণ্ড-বিহীন-জীব'। ইহারাও প্রধানতঃ তিনটী শ্রেণীতে বিভক্ত। চিঙ্গড়ী মৎস্য, কর্কট, জলৌকা, মহীলতা, মশা, মক্ষিকা, বরলা, প্রজাপতি, ফড়িঙ্গ, প্রবালকীট, শঙ্খ, শম্বুক ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় প্রাণিগণ এই সকল শ্রেণীর অন্তর্গত।

কৈলাস-বর্ণন।

কৈলাস ভূধর, অতি মনোহর,
কোটি শশী পরকাশ,
গন্ধর্ব্ব কিন্নর, যক্ষ বিদ্যাধর,
অপসরোগণের বাস।
তরু নানা জাতি, লতা নানা ভাতি,
ফল ফুলে বিকসিত,
বিবিধ বিহঙ্গ, বিবিধ ভুজঙ্গ,
নানা পশু সুশোভিত।
অতি উচ্চতরে, শিখরে শিখরে,
সিংহ সিংহনাদ করে,
কোকিল হুঙ্কারে ভ্রমরী ঝঙ্কারে,
মুনির মানস হরে।

মৃগ পালে পাল, শার্দ্দূল রাখাল,
কেশরী হস্তিরাখাল,
ময়ূর ভুজঙ্গে ক্রীড়া করে রঙ্গে,
ইন্দুরে পোষে বিড়াল।
সবে পিয়ে সুধা, নাহি তৃষ্ণা ক্ষুধা,
কেহ না হিংসয়ে কারে,
যে যার ভক্ষক, সে তার রক্ষক,
হেন দৃশ্য চারি ধারে।
সম ধর্ম্মাধর্ম্ম, সম কর্ম্মাকর্ম্ম,
শত্রু মিত্র সমতুল,
জরা মৃত্যু নাই, অপরূপ ঠাঁই,
কেবল সুখের মূল।
চৌদিকে দুস্তর সুধার সাগর,
কল্পতরু সারি সারি,
মণি বেদি'পরে মণিময় ঘরে,
বসি গৌরী ত্রিপুরারি!

ভারতচন্দ্র।

বায়ু।

বায়ু জীবগণের জীবনস্বরূপ। বায়ুরূপ মহাসাগরে আমরা নিমগ্ন রহিয়াছি। আমরা বায়ুকে দেখিতে পাই আর না পাই বায়ু সর্ব্বদাই আমাদের জীবনের জীবন হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করিতেছে।

বায়ু বর্ণহীন

যদিও অল্প পরিমাণে বায়ুর কোন বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু অধিক পরিমাণে একস্থানে থাকিলে ইহার একরূপ বর্ণ অনুভূত হইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিকেরা আকাশের নীলবর্ণ বায়ুর বর্ণ বলিয়াই মনে করিয়া থাকেন।

বায়ু গন্ধহীন

বায়ুর কোনরূপ গন্ধ নাই। আমরা সময় সময় বায়ুতে যে গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া থাকি তাহা বায়ুর নিজের গন্ধ নহে, বায়ু প্রবাহিত হইবার সময় যে সকল দ্রব্যের সহিত সম্পৃক্ত হয় উহা তাহাদেরই গন্ধ। এইজন্যই বায়ুর আর একটী নাম গন্ধবহ।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে, শব্দ বায়ুকর্ত্তৃক এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চালিত হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত বায়ুকে শব্দবহও বলা যাইতে পারে।

বায়ু যখন স্থির থাকে তখন আমরা ইহার অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারি না; কিন্তু বায়ু যখন গতিবিশিষ্ট হয়, অথবা আমরা যখন গমনাগমন করি, তখনই আমরা বায়ুকে উপলব্ধি করিয়া থাকি।

বায়ুর উপলব্ধি হয় না

আমরা সচরাচর বায়ুকে যে অবস্থায় দেখি, চাপ ও শৈত্যের প্রয়োগদ্বারা তাহার অবস্থান্তর ঘটে। চাপ ও শৈত্য দ্বারা যে বায়ুর আকার পরিবর্ত্তিত হয় ইহা একটী বৈজ্ঞানিক সত্য। অল্পদিন হইল, এই প্রণালী দ্বারা বায়ুকে জলের ন্যায় তরল অবস্থায় পরিণত করা হইয়াছে। এই অবস্থায় জলের ন্যায় বায়ুকেও বোতলে রাখা হইয়াছে এবং ইহা দ্বারা বিজ্ঞানের অনেক নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতেছে।

বায়ুর অবস্থান্তর ঘটে

বায়ুর উপকরণ।

বায়ুতে নিম্নলিখিত পদার্থগুলি আছে।

(ক) অক্‌সিজেন গ্যাস বা অম্লজান বায়ু।

জীবনপোষণ ও প্রজ্বলন-ক্রিয়া-সম্পাদন করাই ইহার ধর্ম্ম।

(খ) নাইট্রোজেন গ্যাস বা যবক্ষারজান বায়ু।

জীবনপোষণ ও দহন-ক্রিয়া-সম্পাদন না করাই ইহার ধর্ম্ম।

(গ) কার্ব্বণিক এসিড গ্যাস বা অঙ্গারক বায়ু।

নাইট্রোজেনের যে দুইটী গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে ইহারও সেই দুইটী গুণ আছে। কিন্তু উদ্ভিদ্‌দিগের জীবনরক্ষা ও পুষ্টিসাধনের জন্য ইহার অত্যন্ত প্রয়োজন।

(ঘ) এমোনিয়া গ্যাস। ইহার কোন বাঙ্গালা নাম নাই।

এই সকল পদার্থ ভিন্ন বায়ুতে সকল সময়ই অল্পাধিক পরিমাণে জলীয় বাষ্প থাকে।

বায়ুকে এই সকল উপকরণে গঠিত করিয়া বিধাতা জগতের অপার কল্যাণ সাধন করিতেছেন। বিজ্ঞানের প্রভাবে আমরা সেই তত্ত্বের যতটুকু অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছি এখানে তাহারই যৎকিঞ্চিৎ আভাস দিতেছি। যদিও জীবের জীবনধারণ ও পুষ্টি-সাধন বিষয়ে অম্লজান নিতান্ত আবশ্যক, কিন্তু রসায়ন-তত্ত্ব অধ্যয়ন করিলে ইহাও অবগত হওয়া যায় যে, বায়ুতে যদি শুধু অম্লজান থাকিত, তাহা হইলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই জীবজন্তু সকল ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত, এবং অনেক পদার্থই অতি সহজে জ্বলিয়া যাইত। এইজন্যই পরম কারুণিক পরমেশ্বর সৃষ্টিরক্ষার জন্য বায়ুতে অম্লজানের সহিত বিপরীত গুণবিশিষ্ট যবক্ষারজান মিশ্রিত করিয়াছেন। বিধাতা এই দুইটী পদার্থকে যে পরিমাণে মিশাইলে জীবের জীবন রক্ষা পায় এবং অন্যান্য পদার্থসমূহেরও উচ্ছেদ সাধন না হয়, তাহা করিয়া আপনার সর্ব্বজ্ঞতা ও অপার দয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

কার্ব্বণিক এসিড্ গ্যাস (অঙ্গারক বায়ু) অতি অল্প পরিমাণে বায়ুমধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়; এমন কি বায়ুতে ইহার অংশ দশ সহস্রভাগে চারিভাগ মাত্র। কিন্তু ইহা দ্বারাও ঈশ্বরের এক মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে। অঙ্গারক বায়ু উদ্ভিদ্‌দিগের একটী প্রধান খাদ্য। উদ্ভিদেরা সূর্য্যকিরণের সাহায্যে,

ক্লোরোফিলের (বৃক্ষপত্রে এক প্রকার সবুজ পদার্থ) দ্বারা সর্ব্বদাই বায়ুমধ্যস্থ কার্ব্বণিক এসিড্ গ্যাস হইতে কার্ব্বণ গ্রহণ করিয়া, আপনাদের পুষ্টিসাধন করে। কার্ব্বণিক এসিড্ গ্যাস আমাদের পক্ষে বিষাক্ত দ্রব্য; কিন্তু উদ্ভিদ্‌দিগের তাহাই খাদ্য। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিরূপিত হইয়াছে যে, উদ্ভিদ্‌দিগের বীজ গঠিত হইবার পক্ষে নাইট্রোজেন গ্যাস নিতান্ত প্রয়োজনীয়; বায়ুতে যে অত্যল্প পরিমাণে এমোনিয়া গ্যাস আছে উদ্ভিদেরা তাহা হইতে নাইট্রোজেন গ্রহণ করিয়া আপনাদের বীজ গঠনের সুবিধা করিয়া লয়; প্রকৃতির মধ্যে তাহাদের নাইট্রোজেন প্রাপ্তির অন্য কোন বন্দোবস্ত নাই।

বায়ুদ্বারা কি কি উপকার সাধিত হইতেছে?

দূষিত, দুর্গন্ধযুক্ত, পচা দ্রব্যাদি যেস্থানে থাকে সেস্থানের বায়ু দূষিত হয়। বায়ু যদি পচা দ্রব্যের সেই দুর্গন্ধ ও বিষাক্ততা চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া দিতে না পারিত, তবে দূষিত পদার্থের দ্বারা যে জীব জন্তুদিগের কত অনিষ্ট সাধিত হইত তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। কিন্তু বায়ুর সম্প্রসারণী শক্তি আছে বলিয়াই অতি অপরিষ্কৃত স্থানের বায়ুরও বিশুদ্ধতা রক্ষা পাইতেছে, এবং বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিয়া জীবজন্তুগণ প্রাণধারণ করিতেছে।

সম্প্রসারণী-শক্তি

আমরা কি জ্ঞাতসারে কি অজ্ঞাতসারে প্রতি মুহূর্ত্তেই

নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস দ্বারা জীবনধারণ করিতেছি। বায়ু না থাকিলে আমাদের নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের কার্য্য চলিত না এবং নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হইলে আমরা মুহূর্ত্তকালও জীবিত থাকিতে পারিতাম না। এই জন্যই জ্ঞানিগণ বায়ুকে 'প্রাণ' আখ্যা দিয়া থাকেন।

নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস

উত্তাপহেতু কিম্বা অন্য কোনও কারণে যদি স্থির বায়ুর কোনও অংশ লঘু হইয়া যায়, তবে ইহা ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়, এবং চতুর্দ্দিকের বায়ু আসিয়া সেই স্থান পূরণ করে। এই হেতু তৎকালে বায়ু গতিবিশিষ্ট হয়। গতিবিশিষ্ট বায়ু দ্বারা অনেক উপকার সাধিত হইয়া থাকে।

ঝড়

মেঘ সকল ইহা দ্বারা নানাস্থানে সঞ্চালিত হয় এবং এইরূপে যে সকল প্রদেশে জলাশয় নাই তথায় ঐ মেঘ বৃষ্টিরূপে পরিণত হইয়া পৃথিবীকে সরস ও উর্ব্বরা করে।

গতিবিশিষ্ট বায়ুদ্বারা আরও অনেক উপকার সাধিত হয়। গতিবিশিষ্ট বায়ু আর্দ্র স্থানকে শুষ্ক এবং শুষ্ক স্থানকে সিক্ত করে।

বায়ুবেগে পণ্যদ্রব্যপূর্ণ জলযান সকল সাগর উপসাগরের বক্ষে ভাসমান হইয়া এক দেশ হইতে অন্য দেশে অনায়াসে গমন করিতেছে। এইরূপ বায়ু বাণিজ্যের পক্ষে বিশেষ সাহায্যকারী। পৃথিবীর সুমেরু ও কুমেরু হইতে দুইটী বায়ু-প্রবাহ নিয়ত বহিতেছে। তাহারই সাহায্যে বাণিজ্য-পোত সকল অতি দ্রুত-

"বাণিজ্য-বায়ু"

গতিতে এক দেশ হইতে বহুদূরদেশে যাইতেছে। এই দুইটী বায়ু-প্রবাহ উত্তরপূর্ব্ব ও দক্ষিণপূর্ব্ব দিক্ হইতে প্রবলবেগে অবিরত বহিতেছে। বাণিজ্যের বিশেষ সাহায্যকারী বলিয়া ইহার নাম "বাণিজ্য-বায়ু" দেওয়া হইয়াছে।

শৈত্যগুণ

উষ্ণদ্রব্যকে শীতল করা বায়ুর আর একটী গুণ। নিদাঘের প্রচণ্ড তপন-তাপে জীবজন্তু ও বৃক্ষ-লতাগণ উত্তপ্ত হইলে সমীরণ ব্যতীত আর কে তাহাদিগের গাত্র সুশীতল করিয়া থাকে?

বীজোৎপাদন

পুষ্পের পরাগকেশরের শিরোভাগে ধূলির ন্যায় এক প্রকার গুঁড় গুঁড় পদার্থ থাকে, বায়ুবেগে সেই পুষ্পরেণু সকল পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে অথবা বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে চালিত হইয়া বীজোৎপাদন করিয়া থাকে। এইরূপে বায়ুদ্বারা উদ্ভিজ্জগতের এক মহৎ উপকার সাধন হইতেছে। বায়ু যে কেবল উদ্ভিদের বীজোৎপত্তি বিষয়েই সাহায্য করে তাহা নহে। অনেক সময় লঘু বীজসকল বায়ু-কর্ত্তৃক এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চালিত হইয়া বৃক্ষোৎপাদন করে। এই প্রকারে এক এক সময়ে এক এক দেশে নূতন নূতন বৃক্ষের উৎপত্তি হয়। এইরূপ দেখা গিয়াছে যে, প্রবল ঝড়ের পরে এক দেশ হইতে নূতন বীজ গিয়া অপর দেশে নূতন বৃক্ষ উৎপন্ন করিয়াছে। ১২৭১ সালের ঝড়ের পরে বঙ্গদেশে একরূপ নূতন বৃক্ষ দেখা গিয়াছে যাহা পূর্ব্বে সচরাচর এদেশে কেহ কখনও দেখিতে পান নাই।

সুচারু বিশ্ব।

মরি কিবা শোভাময় এ ভব ভবন,
যখন যে দিকে চাহি, জুড়ায় নয়ন।
দিবানিশি রবি শশী প্রকাশি গগণে,
ভুবন উজ্জ্বল করে বিমল কিরণে!
স্থলজ কুসুমজালে শোভা করে স্থল,
কমলে শোভিত কিবা সরসী কমল!
শ্যামল বিটপিদল কিবা শোভা ধরে!
লতার ললিত রূপ আঁখি মুগ্ধ করে।
বারিধির ভীমরূপ শোভার ভাণ্ডার,
হেরিয়া না হয় মন বিমোহিত কার?
যে করেছে কোন দিন গিরি আরোহণ,
সে জানে ভূধর শোভা বিচিত্র কেমন!
কোন স্থানে বেগবতী স্রোতস্বতীগণ,
অধোমুখে খরবেগে বহে প্রতিক্ষণ!
স্থানে স্থানে কতশত কন্দরনিকরে,
অহহ! স্বভাব কিবা চারু শোভা ধরে!
কোন স্থানে চরিতেছে মাতঙ্গের দল,
কোন স্থানে ক্রীড়া করে কুরঙ্গ সকল।

এইরূপ জগতের শোভা সমুদয়,
ভাবি, ভাবরসে ভাসে ভাবুক নিচয়।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

অদ্ভুত কলহ।

অতি প্রাচীনকালে দুইজন সন্ন্যাসী এক পর্ব্বতগুহায় থাকিয়া ধর্ম্মসাধন করিতেন। বাল্যকাল হইতে মানব সমাজের বহুদূরে থাকাতে তাঁহারা সংকীর্ণতা ও কুটিলতা, কলহ ও উৎপীড়ন কি বস্তু তাহা জানিতেন না। তাঁহাদের মধ্যে একজন অপর ব্যক্তি অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু বহুকাল হইতে বিশুদ্ধ ধর্ম্মবন্ধুত্বে পরস্পর সম্বদ্ধ হওয়াতে একের সহিত অপরের কোন বিষয়ে সংকোচ বা দূরত্ব ছিলনা। একদিন কনিষ্ঠ সাধু বয়োজ্যেষ্ঠকে বলিলেন, "শুনিয়াছি লোকালয়ে সামান্য বিষয় লইয়া কত কলহ-হয়, এস আমরা দুজনে মিলিয়া কিছু কাল বিবাদ করি।" জ্যেষ্ঠ সাধু ঈষৎ হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন, "তুমি কি ঝগড়া করিতে পারিবে?" কনিষ্ঠ কহিলেন, "কেন পারিবনা? তুমি আমাকে একবার শিখাইয়া দিলেই আমি বিলক্ষণরূপে পারিব।" তখন জ্যেষ্ঠ সাধু কনিষ্ঠকে এক-

খণ্ড প্রস্তর দেখাইয়া বলিলেন, "মনে কর এই প্রস্তরখণ্ড লইয়া আমাদের বিবাদ হইবে। তুমি বলিবে যে এ প্রস্তরখণ্ড আমার, আবার আমি বলিব যে ইহা আমার; এইভাবে এই সামান্য শিলাখণ্ড লইয়া আমাদের মধ্যে বিবাদ বাধিবে।" বড় সাধুর নিকট এইরূপে কলহ করিতে শিক্ষা করিয়া ছোট সন্ন্যাসী বলিয়া উঠিলেন, "এ প্রস্তরখণ্ড আমার;" বড় সাধু অমনি উত্তর করিলেন, "কে বলিল? ইহা তোমার নয়, ইহা আমার।" ছোট সাধু বলিলেন, "বেশ, তোমার হয়ত তুমিই লও।" দুঃখের বিষয় কলহ এইখানেই শেষ হইয়া গেল।

বহু চেষ্টায়ও স্বভাব পরিবর্ত্তিত হয়না। অভ্যাসের প্রভাবও কম প্রবল নহে।

আশ্চর্য্য ন্যায়পরায়ণতা।

গীয়াসুদ্দীন তোগলক সম্রাট গীয়াসুদ্দীন বুলবনের এক দাসের পুত্র ছিলেন। গীয়াসুদ্দীন তোগলক পরাক্রান্ত ও সচ্চরিত্র ছিলেন এবং বুদ্ধিবলে দিল্লীর সম্রাট হইয়া ১৩২১ হইতে ১৩২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার শাসনে সকলেই সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁহার অসামান্য ন্যায়পরায়ণতা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণটী প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কথিত আছে যে, সম্রাট গীয়াসুদ্দীন বাল্য হইতে ধনুর্ব্বিদ্যা অভ্যাস করিতে ভাল বাসিতেন। একদা সম্রাট শরসন্ধান করিতেছেন এমত সময়ে দৈবাৎ তাঁহার ধনুক হইতে নিক্ষিপ্ত একটী তীর নিকটস্থ এক বিধবার সন্তানকে আহত করিল। বিধবা সম্রাটের এইরূপ অসাবধানতায় যারপর নাই দুঃখিত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে সুরজদ্দীন নামক কাজীর ধর্ম্মাধিকরণে অভিযোগ উপস্থিত করিল। বিচারক বিষম বিপদে পতিত হইলেন। তিনি কি করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "যদি আমি সম্রাটকে বিচারালয়ে উপস্থিত হইবার জন্য আহ্বান করি, তাহা হইলে হয়ত তিনি আমার আদেশ অমান্য করিবেন, অধিকন্তু, আমি বিষম বিপদে পতিত হইব। পক্ষান্তরে যদি আমি তাঁহাকে আহ্বান না করিয়া তাঁহার অপরাধ উপেক্ষা করি, তবে আমাকে কর্ত্তব্য অবহেলা করার অপরাধে পরমেশ্বরের নিকট দায়ী হইতে হইবে।" এইরূপ অনেক চিন্তার পর কাজী স্থির করিলেন যে, সম্রাটকে আহ্বান করিবার জন্য তিনি একজন কর্ম্মচারীকে প্রেরণ করিবেন। তদনুসারে সম্রাটের নিকট এক কর্ম্মচারী প্রেরিত হইল। কর্ম্মচারী কাজীর আদেশ শীরোধার্য্য করিয়া প্রস্থান করিল। কিন্তু সহসা এইরূপ আদেশ লইয়া সম্রাটের সমীপে উপস্থিত হইতে ভীত হইয়া, কর্ম্মচারী কি উপায়ে সম্রাটের সমক্ষে উপস্থিত হইবে তদ্বিষয়ে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল। অনেক চিন্তার পরে সে

একটী উপায়ও উদ্ভাবন করিল। রাজপ্রাসাদের নিকটে একটী ভজনালয় ছিল। কাজীর প্রেরিত কর্ম্মচারী সেই ভজনালয়ের শিখরদেশে আরোহণ করিয়া অসময়ে লোকদিগকে ভজনের জন্য আহ্বান করিতে লাগিল। সম্রাট সেই ধ্বনি শ্রবণ করিবা-মাত্র অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সেই লোকটীকে তাঁহার সমক্ষে আনয়-নার্থ কতিপয় রক্ষককে আদেশ করিলেন। সেই কর্ম্মচারী সম্রাট-সমীপে উপস্থিত হইয়া সংক্ষেপে সমস্ত নিবেদন করিল, এবং সম্রাটকে অবিলম্বে কাজীর বিচারালয়ে উপস্থিত হইবার জন্য আহ্বান করিল। সম্রাট তৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান হইলেন এবং পরিচ্ছদের নিম্নে একখানি ক্ষুদ্র তরবারি লুক্কায়িত রাখিয়া কাজীর সমক্ষে উপস্থিত হইবার মানসে প্রস্থান করিলেন। সম্রাট কাজীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু কাজী তাঁহার প্রতি কোনরূপ সম্মানপ্রদর্শন করিলেন না। কাজী বিচারাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া সম্রাটকে সম্বোধন পূর্ব্বক অতি গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "আপনি এই দুঃখিনী বিধবার পুত্রকে আহত করিয়া-ছেন ; এখনই আপনি উহার যথোচিত ক্ষতিপূরণ করুন, নতুবা আইন অনুসারে আপনাকে দণ্ড ভোগ করিতে হইবে।" সম্রাট কাজীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক বিধবাকে তৎক্ষণাৎ যথেষ্ট অর্থ প্রদান করিলেন। বিধবা তাহাতে পরিতুষ্ট হইলেন। সম্রাট তখন কাজীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "সুযোগ্য বিচারপতি! অভিযোগকারিণী আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন।" কাজী তখন সেই বিধবাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সম্রাট

যাহা বলিতেছেন তাহা তুমি স্বীকার করিতেছ?” বিধবা সম্মতি-লক্ষণ প্রদর্শন করিলে কাজী তাহাকে বিদায় দিলেন। তৎপরে কাজী বিচারাসন হইতে অবতরণ পূর্ব্বক সম্রাটকে অভিবাদন করিলেন। রাজা পরিচ্ছদের অভ্যন্তর হইতে তরবারিখানি বাহির করিয়া লইয়া কহিলেন, “হে কাজি! কোরাণের অনুশাসন সকল তোমারই দ্বারা বিবৃত হইয়া থাকে; এইজন্যই তোমার আদেশ শীরোধার্য্য করিয়া আমি তোমার বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়াছি। তুমি যদি সত্যপথ হইতে একটুকুও স্খলিত হইতে এই তরবারি দ্বারা তোমার শিরশ্ছেদন করিতাম। এই সঙ্কটপূর্ণ ব্যাপারটী যে সহজে মিটিয়া গেল এজন্য পরমেশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করি। আমার রাজ্যে যে এমন একজন বিচারক আছেন, যিনি আইনের উপর কাহারও প্রাধান্য স্বীকার করেন না ইহা ভাবিলেও ভগবানকে সহস্রবার ধন্যবাদ প্রদান না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিনা।” অনন্তর কাজীও একখানা চাবুক হস্তে লইয়া বলিলেন, “হে সম্রাট! আমিও সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, যদি আপনি আইন অবজ্ঞা করিতেন, তবে আমার হস্তস্থিত এই চাবুকদ্বারা আপনার শরীর ক্ষত বিক্ষত করিতাম। আজ আমাদের উভয়েরই এক মহাপরীক্ষার দিন গেল।”

জল।

বায়ুর ন্যায় জলও আমাদিগের জীবনধারণের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পদার্থ। জল পান করিয়া আমরা তৃষ্ণা নিবারণ করি; শীতল জলে স্নান করিয়া আমরা শরীরের গ্লানি দূর করিয়া থাকি।

জলের গুণ।

জলের গুণ অনেক; তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকটী গুণের উল্লেখ করা যাইতেছে।

অল্প পরিমাণ বিশুদ্ধ জলের কোনও বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে, অধিক পরিমাণে এক স্থানে থাকিলে জলের ঈষৎ পীতবর্ণ লক্ষিত হয়।

জল বর্ণহীন

বিশুদ্ধ জলের কোনও স্বাদ নাই। নদী কিম্বা পুষ্করিণীর আবিল জলে নানাবিধ পদার্থ মিশ্রিত থাকে বলিয়াই উহা পান করিলে একরূপ স্বাদ অনুভূত হয়।

জল স্বাদহীন

পরিষ্কার জলের ভিতরে কোনও উজ্জ্বল বস্তু পতিত হইলে

জল স্বচ্ছ পদার্থ

তাহা উপর হইতে দৃষ্টিগোচর হয়।

স্পিরিট, এসিড্ প্রভৃতি তরল পদার্থে কতকগুলি কঠিন বস্তু রাখিলে তাহা ক্রমশঃ দ্রবীভূত হইয়া যায়; কিন্তু প্রায় সমস্ত কঠিন পদার্থই জলের সহিত মিশ্রিত করিলে অল্পাধিক পরিমাণে দ্রবীভূত হয়। (একখণ্ড ফৈটকিরি কিম্বা মিছরী একটা জলপূর্ণ পাত্রে রাখিলে ক্ষণকালের মধ্যেই গলিয়া যায়।) এই কারণেই জলের দ্বারা যেমন অনায়াসে দ্রব্যাদির অবিশুদ্ধতা দূরীভূত হয় এরূপ আর কোন বস্তুর দ্বারাই হইতে পারে না। অস্মদ্দেশীয় লোকেরা প্রতিদিন ভাণ্ড, বাসন, আসন, বসন জলের দ্বারা ধৌত করিয়া পরিশুদ্ধ করিয়া লয়; তাহারা হস্ত মুখ প্রক্ষালন না করিয়া কোন দ্রব্য ভক্ষণ করে না; চিকিৎসকগণ রোগীকে স্পর্শ করিয়া হস্ত প্রক্ষালন করিয়া থাকেন। এই সুন্দর প্রথাটী এই জন্যই অবলম্বিত হয় যে, ইহা দ্বারা অনায়াসেই ময়লা দূরীভূত হইয়া থাকে।

জল সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট দ্রাবক

একটী পূর্ণ কলসী নদী কিম্বা পুষ্করিণীর জলের ভিতরে নাড়িলে অতি লঘু বোধ হয়, কিন্তু উপরে তুলিবার সময় অতি ভারী বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে, জল বস্তুসমূহকে ভাসাইয়া তুলিতে চেষ্টা করে। জলের এইরূপ ভাসাইয়া তুলিবার শক্তি

জলের ভাসাইবার শক্তি

আছে বলিয়াই জলের উপর দিয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জাহাজ ও নৌকা সকল ভাসিয়া যাইতে পারে।

জলের বন্ধুরতা নাই

কোন একটা ভারী বস্তু যদি ভূমির উপর দিয়া টানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে যেরূপ শক্তির প্রয়োজন, তদ্রূপ বস্তুকে সেইরূপে জলের উপর দিয়া টানিয়া লইতে তদপেক্ষা অনেক কম শক্তি-প্রয়োগের আবশ্যক। জলের বন্ধুরতা না থাকাই ইহার প্রধান কারণ। এই জন্যই জলের উপর দিয়া প্রতিদিন অসংখ্য অসংখ্য ভারী বস্তু সকল জাহাজে ও নৌকাযোগে এক দেশ হইতে অন্য দেশে অনায়াসে নীত হইতেছে। এইরূপে নদী সকল প্রশস্ত রাজপথের কার্য্য করিতেছে।

জল আপনার সমতলত্ব রক্ষা করিতে চেষ্টা করে।

পরস্পর সংযুক্ত দুইটী নলের একটীতে জল ঢালিয়া দিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অপরটীর মধ্য দিয়া প্রায় সমান উর্দ্ধে জল উঠিয়াছে। জলের এই বিশেষ গুণটীদ্বারা আমাদিগের অনেক উপকার সাধিত হইতেছে। সহরে এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াই পয়ঃপ্রণালী দ্বারা জলাগম করা হয়। একটী উচ্চস্থানে জলাধারে জল সঞ্চিত করিয়া রাখা হয়। সেই জলাধারের সহিত সংলগ্ন নলের ভিতর দিয়া জল প্রবাহিত হইয়া সহরের চতুর্দ্দিকে যাইতেছে। মূল নলের সহিত সংযুক্ত সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নল সকল দিয়া এক সময়ে চতুর্দ্দিকে জল যাইতেছে। উচ্চ স্থান হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হয় বলিয়া জল উচ্চ দিকেই উত্থিত হইতে চায়, এক কথায়,

জল আপনার সমতলত্ব রক্ষা করিতে চায়। জলের এই গুণ না থাকিলে পয়ঃপ্রণালীদ্বারা ইচ্ছামত প্রচুর পরিমাণ জলাগম করিয়া বহু জনাকীর্ণ নগরের লক্ষ লক্ষ অধিবাসিগণের জীবন রক্ষা করা কঠিন হইত।

জলের ভিন্ন ভিন্ন আকার।

বাষ্পীয়, তরল ও কঠিন এই তিন আকারেই আমরা জলকে দেখিতে পাই।

উষ্ণ প্রধান দেশে আমরা জলকে সচরাচর তরল অবস্থাতেই দেখিতে পাই। উত্তাপদ্বারা জল বাষ্পরূপে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া মেঘ, বৃষ্টি, কুজ্‌ঝটিকা প্রভৃতিতে পরিণত হয়। আবার অত্যন্ত শীতলতা দ্বারা জল ঘনীভূত হইয়া কঠিন বরফের আকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপে সমুদ্র, হ্রদ, নদী প্রভৃতির জল উষ্ণ হওয়াতে নিয়তই বাষ্প উদ্‌গত হইতেছে। আবার এই বাষ্প-রাশির কিয়দংশ মেঘাকারে পরিণত হইয়া বৃষ্টি দ্বারা পৃথিবীর সরসতা রক্ষা করিতেছে; কিয়দংশ কুজ্‌ঝটিকারূপে এবং অব-শিষ্টাংশ নীহাররূপে পরিণত হইয়া আমাদিগের বিবিধ কল্যাণ সাধন করিতেছে। বস্তুতঃ বাষ্প, জল ও বরফ ইহারা মূলে একই পদার্থ। ভিন্ন ভিন্ন কারণে এক পদার্থের তিনটী আকারভেদ মাত্র ঘটিয়া থাকে। জল কঠিন অবস্থায় পরিণত হইলে—বরফের আকার প্রাপ্ত হইলে,উহা দ্বারা আমাদের অশেষ কল্যাণসাধন হয়।

কঠিন অবস্থায় পরিণত হইলে জলের আয়তন বৃদ্ধি পায়। বর্ষা-কালে পর্ব্বতের গহ্বরে ও রন্ধ্রে রন্ধ্রে বৃষ্টির জল অনুপ্রবিষ্ট হইয়া শীতকালে যখন কঠিন আকারে পরিণত হয়, তখন তাহার আয়তন বাড়িতে থাকে; পুনঃ পুনঃ এইরূপ হওয়াতে প্রস্তরখণ্ড-সকল ভাঙ্গিয়া পড়ে। এইরূপে ঐ প্রস্তরখণ্ডসকল আবার ভাঙ্গিয়া টুকরা হইয়া যায় এবং অবশেষে চূর্ণ হইয়া মৃত্তিকারূপে পরিণত হয়।

পদার্থ মাত্রেরই সাধারণ গুণ এই যে, উত্তাপ দিলে তাহা-দের আয়তন বৃদ্ধি পায়, এবং শীতল করিলে তাহারা সঙ্কুচিত হয়। জলেরও এই গুণ আছে। কিন্তু ইহাকে শীতল করিয়া ঘনীভূত করিতে গেলে দেখা যায় যে, প্রথমে ইহা সঙ্কুচিত হইতে থাকে, পরে জমাট হইবার পূর্ব্বে এক * স্থানে আসিয়া ইহার পূর্ব্বোক্ত গুণের পরিবর্ত্তন হয়; অর্থাৎ এই স্থান হইতে জমাট না হওয়া পর্য্যন্ত শীতল করিলে ইহার আয়তন বৃদ্ধি পায় এবং উত্তাপ দ্বারা ইহাও সঙ্কুচিত হয়। জলের এই গুণ থাকাতে জলের উপরে বরফ জন্মে। জলের উপরিভাগে বরফ জন্মিলেও তাহার অভ্যন্তর অপেক্ষাকৃত উষ্ণ থাকে, ইহাতে জলজন্তুগণের মহৎ উপকার সাধিত হয়। যদি জলের এই গুণ না থাকিত, তবে শীতপ্রভাবে

জলের বিশেষ গুণ

* সেণ্টিগ্রেড তাপমান যন্ত্রের ৪ ডিগ্রী।

সুমেরু-সমুদ্রের সমস্ত জল জমাট হইয়া কঠিন হইত, এবং অসংখ্য অসংখ্য জীব প্রাণ হারাইত। তদ্দারা স্থষ্টির যে কি পরিমাণ ক্ষতি হইত তাহা নিরূপণ করা মনুষ্যের সাধ্য নহে।

জলের উপকরণ।

(ক) হাইড্রোজেন গ্যাস বা জলজান বায়ু (দুই ভাগ)।

(খ) অক্‌সিজেন গ্যাস বা অম্লজান বায়ু (এক ভাগ)। এই দুই পদার্থের রাসায়নিক সংযোগে জলের সৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে কাহারও গুণ জলে বর্ত্তে না; রাসায়নিক ক্রিয়ায় জল নূতন গুণ লাভ করিয়া থাকে।

রসায়ন শাস্ত্রে জলের ন্যায় গুণবিশিষ্ট পদার্থ আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অক্‌সিজেন বা অম্লজান বায়ুর সহিত অন্য মৌলিক পদার্থের সংযোগে যে সকল বস্তু উৎপন্ন হয়, সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহাদের কতকগুলিকে জলে মিশাইলে তাহাদের স্বাদ অম্ল হয়; অপরগুলি বিপরীত গুণবিশিষ্ট হয়। একটী রক্তজবা ফুল একখণ্ড কাগজে ঘর্ষণ করিলে যে রঙ হয় তাহা ঐ অম্লরসযুক্ত পদার্থের সংযোগে লালবর্ণ ধারণ করে; এবং ঐ বিপরীত * গুণবিশিষ্ট পদার্থের সংযোগে নীলবর্ণ ধারণ করে। জল যদিও এই অম্লজানের সহিত জলজান নামক আর

জলের বিশেষ রাসায়নিক গুণ

---

* যথা চুণের জল।

একটী মৌলিক পদার্থের সংযোগে উৎপন্ন হইয়াছে, তথাপি ইহাতে উপর্যুক্ত দুইটী গুণের একটীও পরিলক্ষিত হয় না। সুতরাং রসায়ন-তত্ত্বে ইহা এক অপূর্ব্ব বস্তু। জলের এই অসাধারণ গুণ থাকাতে রসায়ন-তত্ত্বের যে কি মহৎ উপকার সাধিত হইয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ইহা দ্বারা জ্ঞানময় বিধাতার যে কিরূপ জ্ঞান-কৌশল প্রকাশিত হইয়াছে তাহা চিন্তা করিলে হৃদয় যুগপৎ বিস্ময়ে অভিভূত ও আনন্দ-রসে আপ্লুত হয়।

বিশুদ্ধ পানীয় জল অতি দুর্লভ বস্তু। বৃষ্টির জলই সর্ব্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ। কিন্তু বাতাসের মধ্য দিয়া আইসে বলিয়া বাতাসের মধ্যস্থ অবিশুদ্ধ পদার্থসমূহ ইহার সহিত কিয়ৎপরিমাণে মিশিয়া যায়। সুতরাং সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ জল প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

বিশুদ্ধ পানীয় জল

ঝরণার জল অতীব উপকারক। ইহাতে এমন অনেক পদার্থ মিশ্রিত থাকে যাহা দ্বারা ঔষধের কাজ করে। ঝরণার জলে লৌহ থাকে এবং আরও অনেক উৎকৃষ্ট পুষ্টিকারক পদার্থ থাকে। চিকিৎসকেরা অনেক সময় রোগবিশেষে ঔষধের ব্যবস্থা না করিয়া এই প্রকার জলেরই ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

সামুদ্রিক-প্রবাহ।

সুমেরু-সমুদ্র হইতে একটী জলস্রোত "বাণিজ্য-বায়ু" দ্বারা প্রবাহিত হইয়া মেক্সিকো উপসাগরে আসিয়া উপস্থিত হয়। মেক্সিকো উপসাগর বিষুব-রেখার অতি নিকটবর্ত্তী বলিয়া এই

স্থানের জল উষ্ণ হয়, এবং বায়ু-প্রবাহ দ্বারা সর্ব্বদাই উচ্ছ্বসিত হওয়াতে এই স্থান হইতে একটী উষ্ণ জলস্রোত নিউফাউণ্ড ল্যাণ্ডের উপকূল দিয়া নরওয়ে ও সুইডেনের দিকে গমন করে এবং তথা হইতে ক্যারেবিয়ান সাগর পর্য্যন্ত গমন করিয়া পুনরায় মেক্সিকো উপসাগরে ফিরিয়া আইসে। এইরূপে নরওয়ে, সুইডেন, ইংলণ্ড প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশসমূহ ইহা দ্বারা কিয়ৎ-পরিমাণে উষ্ণতা লাভ করিয়া থাকে।

সামুদ্রিক-প্রবাহকে সমুদ্র বক্ষঃস্থ নদী বলিলেও চলে। বস্তুতঃ "সামুদ্রিক প্রবাহ" নিশ্চল লবণাক্ত অপার জলরাশির বক্ষের উপর দিয়া নদীর ন্যায় প্রবলবেগে বহিয়া যায়। সমুদ্রের যে অংশে এই প্রবাহ বহমান হয় তাহার বর্ণ অপরাংশ হইতে অন্য-রূপ, তাহার জলের স্বাদও বিভিন্ন। দুই দিকে অপার জলধি-বারি নদীতটের ন্যায় স্থির ভাবে স্থিতি করিতেছে; মধ্য দিয়া খরস্রোতে "সামুদ্রিক-প্রবাহ" বহিয়া চলিয়াছে।

ঘুম।

ঘুমিয়ে পড়েছে শিশুগুলি,
খেলা ধূলা সব গেছে ভুলি!
ধীরে নিশীথের বায় আসে খোলা জানালায়,
ঘুম এনে দেয় আঁখি পাতে,
শয্যায় পায়ের কাছে খেলনা ছড়ান' আছে,
ঘুমিয়েছে খেলাতে খেলাতে।
এলিয়ে গিয়েছে দেহ, মুখে দেবতার স্নেহ
পড়েছে রে ছায়ার মতন,
সারারাত স্নেহ-সুখে তারাগুলি চায় মুখে,
যেন তারা করি গলাগলি,
কত কি যে করে বলাবলি!
যেন তারা আঁচলেতে, আঁধারে আলোতে গেঁথে
হাসি-মাখা সুখের স্বপন,
ধীরে ধীরে স্নেহভরে শিশুর প্রাণের পরে
একে একে করে বরিষণ!
কাল যবে রবিকরে কাননেতে থরে থরে
ফুটে ফুটে উঠিবে কুসুম,
ওদেরো নয়নগুলি ফুটিয়া উঠিবে খুলি,
কোথায় মিলায়ে যাবে ঘুম!

প্রভাতের আলো, জাগি, যেন খেলাবার লাগি
ওদের জাগায়ে দিতে চায়,
আলোতে ছেলেতে ফুলে এক সাথে আঁখি খুলে
প্রভাতে পাখীতে গান গায়!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সিংহলদ্বীপ বা স্বর্ণলঙ্কা।

আসিয়ার মানচিত্র খুলিলেই ভারতের দক্ষিণাংশে ভারত মহাসাগরের বক্ষে মনোহর সিংহলদ্বীপ দৃষ্টিগোচর হয়। সিংহলদ্বীপ আমাদের সেই প্রাচীন স্বর্ণলঙ্কা। মহাকবি বাল্মীকির রামায়ণে বর্ণিত আছে যে, লঙ্কা এককালে রাবণের রাজধানী ছিল। সূর্য্যবংশীয় রাজকুমার রামচন্দ্র রাবণের লঙ্কাপুরী আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং যুদ্ধে রাবণকে সবংশে নিধন করিয়া স্বীয় পত্নী সীতাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। এই সকল বিষয় রামায়ণ পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায়। সিংহলের "মহাবংশ" নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, বিজয় সিংহ নামক এক রাজকুমার ভারতবর্ষ হইতে (খ্রীষ্টের ৫৪৩ পূর্ব্ব শতাব্দীতে) পিতৃকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া বহু সহচর সমভিব্যাহারে সমুদ্রযাত্রা করেন, এবং অসংখ্য

বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া সিংহলে উপনীত হন। বিজয় সিংহ সিংহলে উপস্থিত হইয়া তথাকার আদিম নিবাসীদিগকে যুদ্ধে জয় করিয়া তথায় রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। অন্যান্য গ্রন্থেও এ বিষয়ের উল্লেখ আছে। কথিত আছে যে, বিজয়ের বংশীয় উপাধি "সিংহ" হইতে ঐ দ্বীপের বর্ত্তমান নাম "সিংহল" সমুদ্ভুত হইয়াছে, এবং বিজয় যখন সিংহলের উপকূলে উপনীত হইয়াছিলেন, তখন ঐ উপকূলের তাম্রবর্ণ বালুকার উপর তাঁহার হস্ত পতিত হইয়াছিল বলিয়া উহার আর একটী নাম "তাম্রপাণি" হইয়াছে। গ্রীক ও রোমকগণের নিকট সিংহল "ট্যাপ্রোবেন্" নামে পরিচিত ছিল। কেহ কেহ মনে করেন যে, এই "ট্যাপ্রোবেন্" শব্দ হইতেই "তাম্রপাণি" শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। বহুকাল পরে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য লেখকগণ সিংহলকে 'সিরনদ্বীপ' নামে অভিহিত করিয়াছেন। কেহ কেহ মনে করেন যে, 'সিরনদ্বীপ' সিংহলদ্বীপের অপভ্রংশ মাত্র।

যাহা হউক, বিজয় সিংহ অতি দক্ষতার সহিত বহুকাল পর্য্যন্ত সিংহলে রাজত্ব করেন। সিংহলের আদিম নিবাসীদিগের মধ্যে জাতিভেদ ছিল না। বিজয় সিংহ সিংহলে জাতিভেদ প্রচলিত করেন। তাঁহার রাজত্বকালে সিংহলে সামাজিক, সামরিক ও শিক্ষাসম্বন্ধীয় উন্নতি কিয়ৎপরিমাণে সাধিত হইয়াছিল। মালাবার উপকূল হইতে দস্যুগণ আসিয়া সময় সময় সিংহলে বড়ই উপদ্রব করিত। ডেইন্স্‌দিগের উপদ্রবে প্রাচীন ব্রিটনগণের যেরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, মালাবার উপকূলবাসী এই

সকল দস্যুগণের উপদ্রবেও সিংহলবাসিগণ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের রাজ্য মধ্যে ভয়ানক বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল। তাহারা এতই হীনবীর্য্য হইয়াছিল যে, যখন ১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দে পর্ত্তুগিজ বীর আলমিইদা কলম্বোতে উপনীত হইয়াছিলেন তখন তিনি সিংহল রাজ্য সাতটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত দেখিতে পাইয়াছিলেন। ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে সিংহল পর্ত্তুগিজদিগের অধিকৃত হইল। পর্ত্তুগিজদিগের নিষ্ঠুর শাসনে সিংহলবাসিগণের দুঃখের সীমা ছিল না। ১৬০২ খৃষ্টাব্দে ওলোন্দাজেরা সিংহলের উপ-কূলে উপস্থিত হন এবং সিংহলের, অন্তর্গত 'ক্যাণ্ডির' রাজার সহিত মিত্রতাস্থাপন করিয়া বহুকাল পরে দেশীয় লোকের সাহায্যে পর্ত্তুগিজদিগকে সিংহল হইতে একেবারে দূরীকৃত করেন। ওলোন্দাজদিগের অধিকারকালে সিংহলের অবস্থার অনেক উন্নতি হইয়াছিল। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে ইংরেজদিগের সহিত সিংহলের প্রথম পরিচয় হয়। এই সময় মান্দ্রাজ হইতে ইংরেজেরা সিংহলান্তর্গত, ক্যাণ্ডিরাজের নিকট এক দূত প্রেরণ করেন। কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইল না। পরে ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে যখন ব্রিটেনের সহিত হল্যাণ্ডের অসৌহার্দ্দ ঘটে, তখন ইংরেজেরা ওলোন্দাজদিগের বিরুদ্ধে সিংহলে এক দল সৈন্য প্রেরণ করেন। ওলোন্দাজেরা তখন সিংহলে এতই হীনবল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহারা শত্রুদিগকে পরাজিত করিতে অসমর্থ হইলেন; ইংরেজসৈন্যগণ অনায়াসেই ওলোন্দাজগণকে সিংহল হইতে দূরীকৃত করিয়া দিয়া তথায়

ব্রিটিসকেতন উড্ডীয়মান করিলেন। সিংহলে ইংরেজ রাজত্ব স্থাপনের পর ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্তেই ইহার শাসনভার সংস্থাপিত হয়। পরে ১৮০২ খৃষ্টাব্দে ভারতেশ্বরী ইহার শাসনের স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিলেন। তদবধি এই দ্বীপটী ইংলণ্ডের শাসন-প্রণালী অধীনেই আছে। দুর্জ্জয় পার্ব্বত্য প্রদেশ বহু-কাল পর্য্যন্ত রাজা বিক্রম সিংহের শাসনাধীন ছিল। ইনিই সিংহল-বিজেতা 'সিংহ' বংশীয়গণের শেষ রাজা।

প্রাকৃতিক গঠন।

মানার উপসাগর সিংহলকে ভারতবর্ষ হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য উত্তর দক্ষিণে ২৭১ মাইল; প্রস্থ ১৩৭ মাইল, এবং ব্যাপ্তি ২৪,৫০০ বর্গ মাইল। সিংহলের আকার অনেকটা আম্রফলের মত। দ্বীপটী নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে; প্রায় অযোধ্যার সমান হইবে।

সিংহলের উত্তর পশ্চিম প্রান্ত পীতবর্ণ বালুকাময় উচ্চ বেলা-ভূমিতে পরিশোভিত ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈল-শ্রেণীতে পরিপূর্ণ।

উপকূল

"আডামস্‌ব্রিস" নামক পর্ব্বত-শ্রেণী সেতুস্বরূপ হইয়া ভারতবর্ষের সহিত সিংহলকে প্রায় সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। ভারতের দক্ষিণ প্রান্ত হইতে সিংহল পর্য্যন্ত শ্রেণীবদ্ধ এই পর্ব্বত-মালা "সেতুবন্ধ" নামে অভিহিত। কথিত আছে যে, হনূমান রামের আজ্ঞায় এই সেতু বন্ধন করিয়াছিলেন।

'সেতুবন্ধ' দেখিলেও মনে হয় যে, সাগর-বিযুক্ত এই দ্বীপটী

ভারতের সহিত মিলিত করিবার জন্যই যেন কোনও অসামান্য শিল্পী একটী অত্যদ্ভুত শৈল-সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, কাল-প্রভাবে জলধির তরঙ্গাঘাতে তাহা ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। বহুকাল পূর্ব্বে মালাবার উপকূল হইতে করমাণ্ডেল উপকূলে জলপথে গমন করিতে হইলে সিংহলের চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া যাইতে হইত। এখন আর তাদৃশ ক্লেশস্বীকার করিতে হয় না। এখন যাতা-য়াতের অনেক সুবিধা করা হইয়াছে। 'মানার-পথ' ও 'পাম্বেন-পথ' নামে দুইটী জল-পথ পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান্ ছিল। 'মানার-পথ' দিয়া অতি ক্ষুদ্র জলযান অতি কষ্টে গমন করিতে পারে; বহুব্যয়ে 'রামেশ্বর' ও সিংহলের মধ্যবর্ত্তী 'পাম্বেন' নামক জল-পথটীর পঙ্কোদ্ধার করিয়া বাণিজ্য-পোত গমনাগমনের সুবিধা করা হইয়াছে। এখন এই সুগম পথ দিয়া প্রকাণ্ড জাহাজ সকল অনায়াসে যাতায়াত করিয়া থাকে।

পশ্চিম ও দক্ষিণ পুলিন দুইটী অপেক্ষাকৃত নিম্নগ। এই সৈকতদ্বয়ের অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিলে হৃদয় আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হয়। সৈকতের প্রান্তভাগে নারিকেল বৃক্ষশ্রেণী উন্নত গ্রীব তাপসগণের ন্যায় সুদৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছে। বারিধির বীচিমালা মুহুর্মুহু তাহাদের চরণ চুম্বন করিয়া পাদোদক পান করিতেছে। পশ্চিম ও দক্ষিণ উপকূল দিয়া যতদূর যাও, নারিকেল বৃক্ষরাজি সর্ব্বত্রই নয়ন-পথে পতিত হইবে। ইহারা যেন প্রাচীরের ন্যায় লঙ্কার পশ্চিম ও দক্ষিণ দ্বার রুদ্ধ করিয়া শত্রুদিগের আক্রমণ হইতে এই দ্বীপটীকে অবিরত রক্ষা করি-

তেছে। এত অপর্য্যাপ্ত নারিকেল বৃক্ষের সমবায় আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয়না। উপকূলের নিকটে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপ-সাগর রহিয়াছে। স্থানীয় লোকেরা এই সকল উপসাগরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলযান সকল রক্ষা করিয়া থাকে।

পয়েণ্ট ডি গল হইতে ত্রিনকমলি পর্য্যন্ত পূর্ব্ব উপ-কূলটী অন্যরূপ। এস্থানে মনোহর বৃক্ষশ্রেণী নাই, সৈকতের স্বাভাবিক কোনও শোভাও নাই; তটের প্রান্তদেশে স্থানে স্থানে শৈলরাজি জলধি-বক্ষে মস্তক উত্তোলিত করিয়া বিদ্যমান রহি-য়াছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জলযান সকল এই উপকূলের পার্শ্ব দিয়া অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারে; কিন্তু যাতায়াতের কালে নাবিকগণকে বিশেষরূপে সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়। মগ্ন গিরিসকল যে স্থানকে বিঘ্ন-সঙ্কুল করিয়া রহিয়াছে, নাবিকগণের তাহা অবিদিত নাই; সেই জন্যই তাহারা অত্যন্ত বিপজ্জনক মগ্নগিরিসকল সুকৌশলে অতিক্রম করিয়া নিরাপদে উপকূলে উত্তীর্ণ হইতে পারে। • *

দূর হইতে দৃষ্টি করিলে সিংহলকে বাস্তবিক স্বর্ণলঙ্কা বলি-য়াই প্রতীতি জন্মে। পরম রমণীয় শৈল-শ্রেণীর মধ্যস্থানে "আডামস্‌পিক" নামক ভূধর আলোক-স্তম্ভের ন্যায় বিরাজমান থাকিয়া সর্ব্বদাই শ্রান্ত নাবিকগণকে পথপ্রদর্শন করিতেছে। নিবিড় পাম * রাজির শ্যামচ্ছায়া হেতু কলম্বোস্থ আলোকমঞ্চ স্পষ্ট পরিদৃশ্যমান হয়না; দূর হইতে এই নিবিড়

---

* তালবৃক্ষের ন্যায় এক জাতীয় বৃক্ষ।

পামরাজি জলধি-বক্ষে একখানি 'পাম-কুঞ্জ' বলিয়াই ভ্রান্তি জন্মে।

"আডামস্‌পিক" সিংহলের সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত, বহুকাল পর্য্যন্ত লোকের মনে এইরূপ বিশ্বাস ছিল। কিন্তু পরিমাপ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সমুদ্রের সমতল ক্ষেত্র হইতে ইহা ৭,৩৫২ ফুট মাত্র উচ্চ। সিংহলে ইহা অপেক্ষা উচ্চতর পর্ব্বত রহিয়াছে। কিন্তু "আডামস্‌পিকের" একটী বিশেষ মাহাত্ম্য আছে। এই শৈলশিখরে একটী খাত আছে। স্থানীয় ব্রাহ্মণেরা তাহা শঙ্করের পদ-চিহ্ন বলিয়া বিশ্বাস করেন, বৌদ্ধগণ বুদ্ধের পাদ-খাত এবং মুসলমানেরা আদামের পদ-চিহ্ন বলিয়াই প্রমাণ করিতে প্রয়াস পান। পর্ত্তুগিজ খ্রীষ্টানগণও এই সামান্য দেবোত্তরের উপর আপনাদের অধিকার স্থাপন করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। তাঁহাদের মধ্যে এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে বটে, কিন্তু একদলের লোকেরা ইহাকে সাধু টমাসের পাদ-খাত বলিয়াই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরাই এই সামান্য খাতটী অতি পবিত্র বলিয়া জ্ঞান করেন। বৌদ্ধসন্ন্যাসিগণই এই পবিত্র তীর্থস্থানের সেবক। তাঁহারা এই খাতের উপর একটী মনোহর ছাদ নির্ম্মাণ করিয়া ইহাকে রক্ষা করিতেছেন। বহু দূরদেশ হইতে যাত্রিগণ এই তীর্থ দর্শন করিতে আগমন করিয়া থাকেন।

পর্ব্বত

সিংহল যদিও সম্পূর্ণরূপে সমুদ্রগর্ভে, যদিও সমুদ্র হইতে

সর্ব্বদাই বাষ্পোদ্গম হইতেছে এবং দ্বীপটীই প্রায় সমভূম, তথাপি এখানে কোনও বৃহৎ নদী নাই।

নদী

বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টির জলে নদীগুলি পূর্ণ হয় এবং তখন তাহারা ভয়ানক বেগবতী হইয়া উঠে। কিন্তু ঋতুপরিবর্ত্তনে যখন নদীর জল শুষ্ক হইয়া যায়, তখন সিংহলে এমন একটীও নদী থাকেনা যাহার উপর দিয়া অশ্বারোহণপূর্ব্বক গমন করা যায় না।

জলযান থাকিবার পক্ষে ত্রিনকমলির ন্যায় এরূপ সুন্দর, সুবিস্তীর্ণ, নিরাপদ স্থান পৃথিবীতে আর আছে কিনা সন্দেহ স্থল।

বন্দর

ভারতবর্ষের উপকূলসমূহের ঋতুপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সিংহলের ঋতুপরিবর্ত্তনের অতি সামান্যই প্রভেদ আছে। বৎসরের মধ্যে দুইবার প্রধানতঃ ঋতুপরিবর্ত্তন হয়।

ঋতু ও জল বায়ু

দক্ষিণপশ্চিম ও উত্তরপূর্ব্ব দিক হইতে দুইটী বায়ু-প্রবাহ প্রবাহিত হইয়া এই দুইটী ঋতু পরিবর্ত্তন ঘটায়। দক্ষিণপশ্চিম বায়ু-প্রবাহ সচরাচর বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসেই প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হয়। উত্তরপূর্ব্ব বায়ু-প্রবাহ কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যেই উপস্থিত হইয়া থাকে। দক্ষিণপশ্চিম বায়ু সমুদ্র হইতে আইসে বলিয়া উহাতে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প থাকে। সুতরাং যখন এই সুস্নিগ্ধ-বায়ু প্রবাহিত হয়, তখন অত্যন্ত বৃষ্টি হইয়া নদী খাল জলে পরিপূর্ণ হয়, বৃক্ষলতাদি সরস ও সতেজ হইয়া উঠে। কিন্তু উত্তরপূর্ব্ব বায়ু

প্রবাহিত হইলে আবার সমস্ত শুষ্ক হইয়া যায়। সমুদ্র গর্ভস্থ বলিয়া সিংহলে ঋতুপরিবর্ত্তন এত অল্প হয় যে, এখানে শীত গ্রীষ্মের আতিশয্য অনুভূত হয়না। এখানে ঋতুসমূহ পর্য্যায়ক্রম পরিত্যাগ করিয়া নিয়তই বিরাজমান রহিয়াছে।

লোকসংখ্যা

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে একবার সিংহলের জনসংখ্যা স্থির করা হয়। তাহাতে সিংহলের অধিবাসিগণের সংখ্যা ২,৪০৬,২৬২ নিরূপিত হইয়াছে।

জন্তু

সিংহলের বনপ্রদেশে হস্তী, ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি জন্তু-গণের বাস, এবং মানার উপসাগরে মুক্তা পাওয়া যায়।

ভাষা

সিংহলে শতকে ৭০ জন লোকের ভাষা সিংহলী; অবশিষ্ট লোকদিগের মধ্যে প্রায় ৬০০০ সহস্র লোক ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে সমাগত প্রায় ১৪,০০০ সহস্র ইউরুসীয়; সুতরাং তাহাদের ভাষাও বিদেশীয়। তদ্ভিন্ন দেশীয় সমস্ত লোকই তামিল ভাষায় কথাবার্ত্তা ও লেখাপড়া করে। সিংহলী ভাষার সহিত পালী ভাষার অতি নিকট সম্পর্ক আছে।

লৌহবর্ত্ম

সিংহলের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লৌহবর্ত্ম দ্বারা কলম্বোকে সংযুক্ত করিবার জন্য সিংহলের শাসনকর্ত্তৃগণের মধ্যে অনেকেই অনেকবার চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হইয়াছিলেন। অবশেষে স্যার চার্লস ম্যাকারথের চেষ্টায় কলম্বো হইতে ক্যাণ্ডি

পর্য্যন্ত ৭৫ মাইল দীর্ঘ একটী লৌহবর্ত্ম খোলা হইয়াছে; ইহাদ্বারা একদিকে যেমন সিংহলবাসী লোকদিগের পরম উপকার সাধিত হইতেছে; অপর পক্ষে তেমনি গবর্ণমেণ্টের প্রচুর অর্থাগমের সুবিধা হইয়াছে।

কৃষি

সিংহলদ্বীপবাসী লোকেরা অন্যান্যকার্য্যাপেক্ষা কৃষিকার্য্য-গুলি করিতেই অধিক ভালবাসে। যদিও তাহাদের কৃষি-কার্য্যোপযোগী যন্ত্র অতি সামান্য, এবং তাহাদের কৃষিকার্য্য প্রণালী অতি সহজ, তথাপি, প্রচুর বৃষ্টির জল পাইলে, তাহারা যথেষ্ট শস্য উৎপন্ন করিতে পারে। চাউলই তত্রত্য লোকদিগের প্রধান খাদ্য, সুতরাং সিংহলের সর্ব্বত্রই প্রচুর পরিমাণে ধান্য উৎপন্ন করা হয়। সিংহলে, ধান্য, নারিকেল, চিনি, তাম্রকূট, দারুচিনি, সিন্‌কোনা এবং চা প্রচুর পরিমাণে জন্মে।

বাণিজ্য

সিংহলে অল্পদিনের মধ্যেই বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৯৬,৩০১ পর্য্যন্ত আমদানী এবং ২২৪,৩৮৮ পর্য্যন্ত রপ্তানী হইয়াছিল। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ৫,৩৩৬,১১৯ পর্য্যন্ত আমদানী এবং ৪,৩৯৪,৪২৭ পর্য্যন্ত রপ্তানী হইতে দেখা গিয়াছে।

ধর্ম্ম

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে সিংহলের অধিবাসিগণের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সংখ্যা নিরূপিত হইয়াছে।

১।	বৌদ্ধ—	১, ৫২০,৫৭৫
২।	হিন্দু—	৪৬৫,৯৪৪
৩।	মুসলমান—	১৭১,৫৪২
৪।	খ্রীষ্টান—	২৪০,০৪২

খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে প্রায় ১৮৬,০০০ রোমান্ কাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত এবং ৫৪০০০ প্রোটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শাখা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। ইহাদের মধ্যে আবার ১৫০,০০০ সিংহলদ্বীপবাসী, ৭২০০০ তামিল এবং ১৮০০ ইউ-রোপীয় ও ইউরুসীয়।

সিংহলে জাতিভেদের ভিত্তি সামাজিক রীতির উপর প্রতিষ্ঠিত; ধর্ম্মের সহিত জাতিভেদের কোনও সম্পর্ক নাই।

সামাজিক নিয়ম

তথায় উচ্চ ও নিম্ন উভয় শ্রেণীর লোকেরাই পৌরোহিত্য পদ লাভ করিতে পারে এবং নিম্নশ্রেণীস্থ লোকও পৌরহিত্য লাভ করিলে শ্রেষ্ঠ বংশীয় লোকদিগের পূজার্হ হইয়া থাকে।

সিংহলে গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে বহু বিদ্যালয় চলিতেছে। রোমান কাথলিক ও অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত খ্রীষ্টানদিগের

ধর্ম্ম

চেষ্টায়ও অনেকগুলি বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। এই সকল বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থেও গবর্ণমেণ্ট বৎসর বৎসর যথেষ্ঠ অর্থ দান করিয়া থাকেন। বঙ্গদেশের ন্যায় সিংহলেও শিক্ষা বিভাগের কর্তৃত্বভার একজন অধ্যাপকের উপর ন্যস্ত আছে।

সিংহলের ন্যায় এরূপ পরম রমণীয়, স্বাস্থ্যকর স্থান পৃথিবীতে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। সিংহলে যিনি একবার গমন করিয়াছেন তিনিই সিংহলের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়াছেন, এবং স্নিগ্ধকর জল-বায়ু সম্ভোগ করিয়া সুস্থ দেহে সবল মন লাভ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন।

বিজ্ঞানের আবিষ্কারকগণ।

বিজ্ঞান-প্রভাবে প্রতিদিনই নূতন নূতন তত্ত্ব সকল আবিষ্কৃত হইতেছে। বিজ্ঞানের আলোকে আমরা সামান্য পদার্থের মধ্যেও গভীর জ্ঞানের উপদেশ প্রাপ্ত হইতেছি। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যসমাজের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে; বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ জীবনের বিবিধ কর্ত্তব্য সকল সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইতেছে। সুতরাং যাঁহাদের দ্বারা নানা বিভাগে নূতন নূতন সত্য সকল আবিষ্কৃত হইয়াছে তাঁহারা নিশ্চয়ই আমাদিগের কৃতজ্ঞতাভাজন। তাঁহাদিগের বিষয় যতই আমরা আলোচনা করিব ততই তাঁহাদিগের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাভক্তি বর্দ্ধিত হইবে, এবং তাঁহাদিগের প্রদর্শিত বৈজ্ঞানিক প্রণালীর অনুগত হইয়া আমরা সত্য লাভ করিতে সমর্থ হইব।

বিজ্ঞানের আবিষ্কারকগণের বিষয় কিছু বলিতে গেলে মহা-মতি বেকনের নামই সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করিতে হয়। তিনিই সর্ব্বাগ্রে বিজ্ঞানালোচনার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিরূপণ সম্বন্ধে যে নূতন প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহা আবিষ্কৃত না হইলে বিজ্ঞানের এতদূর উন্নতি সম্ভবপর হইত না।

বেকন

বেকনের পরে সার আইজ্যাক্ নিউটনের নামই স্মৃতিপথারূঢ় হয়। সার আইজ্যাক বেকনের প্রণালীতে যতটুকু অপূর্ণতা ছিল তাহা দূর করিলেন এবং একটী সামান্য ঘটনা দর্শন করিয়া এক মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ফেলিলেন। বৃক্ষ হইতে ফল পতিত হইতে কেনা দেখে? আমরা ত প্রতিদিনই নানা জাতীয় ফল সকল বৃক্ষ হইতে ভূমিতে পতিত হইতে দেখিতেছি, কিন্তু তদ্দর্শনে আমাদের মনে ত কোনও চিন্তা বা প্রশ্নের উদয় হয় না? নিউটন বৃক্ষ হইতে একটী আতাফল পতিত হইতে দেখিয়া মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম আবিষ্কার করিলেন। আতাফলটী মৃত্তিকায় পতিত হইতে দেখিয়া তাঁহার মনে হইল যে, বস্তু মাত্রেরই আকর্ষণ শক্তি আছে, এবং তদ্দ্বারা সকল বস্তুই পরস্পরকে আকর্ষণ করিতেছে; কিন্তু যে বস্তুর শক্তি অধিক সে সামান্য বস্তুকে অনায়াসেই আপনার দিকে আকর্ষণ করিয়া লয়। একটী অতি তুচ্ছ ঘটনা হইতে কি সুমহৎ কার্য্য সমুৎপন্ন হইল! নিউটন আরও একটী তত্ত্ব নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি সর্ব্বপ্রথমে স্থির করেন

সার আইজ্যাক নিউটন

যে, সূর্য্যালোকে লাল, সবুজ, ভায়লেট (বেগুণে) অরেঞ্জ (কমলা লেবুর রং) হরিদ্রা, নীল, এবং ইণ্ডিগো (গাঢ় নীল) এই সাতটী মূল বর্ণ আছে। এ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আধুনিক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণের মতভেদ আছে। তাঁহারা সাতটী মূল-বর্ণ স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মধ্যেও আবার এ সম্বন্ধে দুইটী ভিন্ন শ্রেণী আছে। এক শ্রেণীর লোকেরা বলেন যে, লাল, সবুজ ও ভায়লেট (বেগুণে) এই তিনটী মাত্র মূলবর্ণ, অবশিষ্ট চারিটী এই মূলবর্ণত্রয়ের পরস্পর সংমিশ্রণেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। অপর শ্রেণীর লোকেরা লাল, হরিদ্রা ও নীল এই তিনটী মূলবর্ণ স্বীকার করিয়া, অবশিষ্ট গুলিকে মিশ্রবর্ণ কহিয়া থাকেন। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে নিউটনের সহিত আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের অনৈক্য থাকিলেও, নিউটনই যে বর্ণতত্ত্বের আবিষ্কারক তাহাতে দ্বিমত নাই। এইরূপ অসা-ধারণ ধীমান্ হইয়াও নিউটন বালকের ন্যায় সরল ও বিনয়ী ছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি অতলস্পর্শ জ্ঞান-সাগরের উপকূলে দাঁড়াইয়া উপল খণ্ড সকল সংগ্রহ করিতেছি, আমার সম্মুখে অনন্ত, অগাধ জ্ঞান-জলধি প্রসারিত রহিয়াছে।"

নিউটনের অসাধারণ চিত্ত-সংযম ছিল। মনের উপর এরূপ আধিপত্য অল্প লোকেরই থাকে। নিউটনের "ডায়েমণ্ড" নামে একটী কুক্কুর ছিল। একদিন নিউটন গণিত শাস্ত্রের আলোচনা করিতে করিতে হঠাৎ তাঁহার অধ্যয়ন-গৃহ হইতে বাহিরে চলিয়া যান। তাঁহার টেবিলের উপর একটী প্রদীপ জ্বলিতেছিল।

ইত্যবসরে কুক্কুরটী প্রদীপ ফেলিয়া দেওয়াতে টেবিলের উপর যে সকল কাগজপত্রাদি ছিল তাহা ভস্মীভূত হয়। নিউটন কিয়ৎকাল পরে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে তাঁহার বহু পরিশ্রমের ফল একবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তিনি একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কেবল এইমাত্র বলিলেন "ডায়েমণ্ড! তুমি যে কি অনিষ্ট করিয়াছ তাহা তুমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছ না!" পরক্ষণেই তিনি গণনায় পুনঃ প্রবৃত্ত হইলেন।

আর একদিন নিউটন তত্ত্বালোচনায় নিমগ্ন রহিয়াছেন এমত সময়ে জনৈক ভদ্র মহিলা তাঁহার সহিত কোনও কার্য্যোপলক্ষে সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। সেই মহিলা নিউটনের অধ্যয়ন-গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, নিউটন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন। রমণী নিউটনের চিন্তা ভঙ্গ করিতে সাহস না করিয়া কিয়ৎকাল তাঁহার আসনের পশ্চাতে দণ্ডায়মানা রহিলেন। নিউটন চুরুট খাইতে খাইতে এক একবার নিকটস্থ মহিলার গাত্র বস্ত্রে চুরুটের ছাই মুছিতে ছিলেন। যখন তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল, আলোচনা শেষ হইল, তখন আসন হইতে উঠিয়া সেই মহিলাকে দেখিতে পাইলেন, এবং তাঁহার গাত্রবস্ত্রে চুরুটের ছাই দেখিয়া লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইলেন। নিউটন অতি কাতর-ভাবে সেই মহিলার নিকট বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। মহিলা বলিলেন "আপনি যেরূপ চিন্তামগ্ন ছিলেন তাহাতে আপনার দুঃখ প্রকাশ করিবার কোন কারণই দেখিতেছি না।"

জ্ঞানবীর গ্যালেলিওর নাম করিলে আজও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। গ্যালেলিও একজন জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিত ছিলেন। তিনিই দূরবীক্ষণ-যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া বিজ্ঞানের পরম উপকার সাধন করিয়াছেন। কিন্তু পৃথিবীর গতি নির্ণয় করাই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। পৃথিবী যে নিয়তই আকাশ-পথে ঘুরিতেছে, এ অভিনব তত্ত্ব আবিষ্কারকরিয়া গ্যালেলিও বিষম বিপদে পতিত হইলেন। পৃথিবী স্থিরভাবে রহিয়াছে, সূর্য্য পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে, এই প্রাচীন বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কথা কহিতে গিয়া গ্যালেলিওকে রোমের রাজবিধি অনুসারে দণ্ডিত হইতে হইল। কিন্তু রাজদণ্ড অবনত-মস্তকে গ্রহণ করিয়াও তিনি বলিতে লাগিলেন "আমাকে দণ্ড দাও আর যাহাই কর, পৃথিবী এখনও ঘুরিতেছে!" যাঁহাদের দ্বারা সত্য জয়যুক্ত হয়, তাঁহারা এই ধাতুরই লোক।

গ্যালেলিও

গ্রীক গণিতশাস্ত্রবেত্তাদিগের মধ্যে আরকিমেডিস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার সহিত সাইরাকিউসের নৃপতির সম্পর্ক ছিল। কথিত আছে, নৃপতি একদা স্বর্ণকারের দ্বারা একটা স্বর্ণমুকুট প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। স্বর্ণকার মুকুট প্রস্তুত করিয়া রাজার হস্তে প্রদান করিলে, নরপতি আরকিমেডিসকে এই মুকুটে অকৃত্রিম স্বর্ণ ব্যতীত অন্য কোনও পদার্থ মিশ্রিত হইয়াছে কি না তাহা নির্ণয় করিতে দেন। আরকিমেডিস একাগ্রচিত্তে এই বিষয় চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এক দিন এই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে একটী ঝরণার নিকট গমন করিলেন। তখন ঝরণার নিম্নে ক্ষুদ্র

আরকিমেডিস

ক্ষুদ্র জলাধার (চৌবাচ্চা) থাকিত, লোকেরা তাহার ভিতরে বসিয়া স্নান করিত। আরকিমেডিস চিন্তাযুক্ত মনে হঠাৎ একটী জলাধারের মধ্যে বসিলেন ; বসিবামাত্র জলাধারের কিয়ৎ পরিমাণ জল উছলিয়া পড়িয়া গেল। আরকিমেডিস তৎক্ষণাৎ সেই অবস্থায় "পেয়েছি, পেয়েছি" বলিয়া উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিতে করিতে রাজসমীপে উপস্থিত হইলেন। ভূতগ্রস্তের ন্যায় সত্যগ্রস্ত হইয়া আরকিমেডিসের বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়াছিল। তিনি নরপতির নিকট উপস্থিত হইয়াও পুনঃ পুনঃ "পেয়েছি, পেয়েছি," বলিয়া আনন্দে চীৎকার করিতে লাগিলেন।

নরপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি পেয়েছ ?" আরকিমেডিস তখন যে সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন রাজসমীপে সংক্ষেপে তাহা ব্যক্ত করিলেন। তিনি বলিলেন যে, কোনও বস্তু জলে রাখিয়া ওজন করিলে তাহার ভার কম হইবে ; অর্থাৎ তাহার ভারে যে পরিমাণ জল স্থানান্তরিত হইবে তাহার গুরুত্ব সেই পরিমাণে কম হইবে। এই তত্ত্ব লাভ করিয়া আরকিমেডিস মনে করিলেন যে, বিশুদ্ধ স্বর্ণ জলের ভিতরে দিলে তাহার যে ওজন হইবে সেই ওজনের অনুপাতানুসারে স্বর্ণমুকুটে অন্য কোন পদার্থ আছে কি না অনায়াসেই স্থির করিয়া লইবেন।

আরকিমেডিসের মনঃসংযমের কথা শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। গ্রীকেরা যখন সাইরাকিউস জয় করিবার জন্য নগর বেষ্টন করিয়াছিল, তখন আরকিমেডিস নগর রক্ষার জন্য প্রাণ-

পণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এ অবস্থায়ও তাঁহার গণিত চর্চ্চার বিরাম ছিল না। শত্রুসৈন্য যখন সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া নগরের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইল, তখনও তিনি বালুকারাশির উপরে ক্ষেত্রতত্ত্বের চিত্র সকল অঙ্কিত করিতেছিলেন। শত্রু-সৈন্য যখন তাঁহাকে বধ করিবার জন্য তাঁহার কেশাকর্ষণ করিয়াছে তখনও তিনি গণিত-তত্ত্বে মগ্ন। একবার মস্তক উত্তোলন পূর্ব্বক শত্রুসৈন্যের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া আবার চিন্তামগ্ন হইয়া রহিলেন। শত্রুগণ যখন সজোরে আঘাত করিল তখন কেবল একবার উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "সাবধান! আমার অঙ্কপাত যেন মুছিয়া যায় না!"

বেঞ্জামিন্ ফ্রাঙ্কলিন আর একটী অসাধারণ লোক। বেঞ্জামিন্ নিরতিশয় অধ্যবসায়গুণে অতি সামান্য অবস্থা হইতে উন্নতি লাভ করেন। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে তিনি একটী বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। তিনি একখানা ঘুড়ী উড়াইতেছিলেন, এমত সময়ে হঠাৎ সামান্য বৃষ্টি হইল। বৃষ্টির জলে ঘুড়ীসংলগ্ন সূত্র সিক্ত হইল। আকাশে তখন মেঘগর্জ্জন ও বিদ্যুৎ প্রকাশ হইতেছিল। সূত্রের যে অংশ ফ্রাঙ্কলিনের হস্তে ছিল তাহাতে একটা লৌহ চাবি সংবদ্ধ করা হইয়াছিল। ফ্রাঙ্কলিন দেখিলেন, তাঁহার হস্তস্থিত চাবি হইতে চড়্ চড়্ শব্দে বিদ্যুৎ-কণা বাহির হইতে লাগিল। এইরূপে বিনা যন্ত্রে বহুদূরস্থ মেঘ হইতে তাড়িত অবতারিত করিয়া ফ্রাঙ্কলিন প্রতিপন্ন

বেঞ্জামিন্ ফ্রাঙ্কলিন

করিলেন যে, তাড়িত কর্ত্তৃকই বিদ্যুৎ ও বজ্র উৎপন্ন হইয়া থাকে।

গ্যালভ্যানি শারীরবিধানের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি একদিন একটা ভেক কাটিয়া, লৌহ শলাকায় ঝুলাইয়া রাখিয়া, ছাত্রগণকে শারীরবিধান বিষয়ে উপদেশ দিতেছিলেন। গ্যাল-ভ্যানি যখন একটা তাম্র শলাকা দ্বারা ভেকটীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি প্রদর্শন করিয়া উপদেশ দিতেছিলেন, তখন তাঁহার হস্তস্থিত তাম্র শলাকাটী সেই লৌহ শলাকার সহিত হঠাৎ সংলগ্ন হওয়াতে ভেকের একখানা পা কুঞ্চিত হইল। তদ্দর্শনে গ্যালভ্যানি কিয়ৎক্ষণ অবাক্ হইয়া রহিলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছিলেন যে, জীবদেহে তাড়িত সঞ্চালিত হইলে মাংসপেশী কুঞ্চিত হয়। অকস্মাৎ তাঁহার সেই কথা স্মরণ হইল, এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার বিস্ময় দূর হইল। তিনি স্থির করিলেন যে, ভেকের শরীর মধ্যে তাড়িত আছে, তাহা এই শলাকাদ্বয়ের সংযোগে চালিত হওয়াতে উহার এইরূপ আকুঞ্চন হইয়াছে।

গ্যালভ্যানি ও ভল্‌টা

ভল্‌টানামক আর এক অধ্যাপক গ্যালভ্যানির এই তত্ত্ব নিরূপণের কথা শ্রবণ করিয়া এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনেক চিন্তার পরে তিনি এ সম্বন্ধে একটী স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। তিনি স্থির করিলেন যে, গ্যাল-ভ্যানির হস্তের তাম্র শলাকা লম্বমান লৌহ শলাকার সহিত সম্মিলিত হওয়াতে দুই ভিন্ন ধাতুনির্ম্মিত পদার্থের সংযোগে

তাড়িত উৎপন্ন হইয়াছে, এবং তাহা ভেকের পায়ের মধ্য দিয়া সঞ্চালিত হওয়াতে উহা কুঞ্চিত হইয়াছিল। পরীক্ষা দ্বারা ভলটা এই তত্ত্ব প্রতিপন্ন করিলেন এবং অদ্যাপি তাঁহার এই মত গৃহীত হইতেছে।

সার হাম্ফ্রে ডেভি এক প্রকার প্রদীপ (সেফটী ল্যাম্প) উদ্ভাবন করিয়া বহু লোকের প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। খনির ভিতর অগ্নি লাগিয়া অসংখ্য লোকের মৃত্যু হইত। খনির গভীর গর্ত্তে দিবসেও অমানিশার গাঢ় অন্ধকার। কাজেই খনকগণকে প্রদীপ জ্বালিয়া কার্য্য করিতে হইত। সার হাম্ফ্রে ডেভি কর্ত্তৃক সেফটী ল্যাম্প আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে খনকগণকে সাধারণ প্রদীপের সাহায্যেই কার্য্য করিতে হইত। কিন্তু ইহার বিপদ এই ছিল যে, খনির অভ্যন্তরে এক প্রকার গ্যাস উৎপন্ন হইয়া, অনাবৃত প্রদীপে লাগিয়া সময় সময় ভয়ানক অগ্ন্যুৎপাত হইত। সেফটী ল্যাম্প উদ্ভাবন করিয়া দিয়া সার হাম্ফ্রে ডেভি জনসমাজের কি পরিমাণ উপকার সাধন করিয়াছেন, যাঁহাদের কিঞ্চিন্মাত্রও বিচারশক্তি আছে তাঁহারাই তাহা অনুভব করিতে পারিবেন। সার হাম্ফ্রের ন্যায় প্রাতঃস্মরণীয় জনহিতকর ব্যক্তিগণ মনুষ্যমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন। এতদ্ব্যতীত সার হাম্ফ্রে ডেভির আরও আবিষ্ক্রিয়া আছে। তিনি ১৮০৮ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে তাড়িত দ্বারা কতকগুলি বস্তুকে বিশ্লিষ্ট করিয়া নূতন কতকগুলি ধাতু, আবিষ্কার করেন। ইহার পর হইতে তাড়িতের সাহায্যেই বস্তু সক-

সার হাম্ফ্রে ডেভি

লের রাসায়নিক বিয়োগ নিষ্পন্ন হইতেছে। এই তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াও সার হাম্ফ্রে ডেভি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বালোচনার পক্ষে অনেক সাহায্য করিয়া গিয়াছেন।

কেপ্‌লার গণিতশাস্ত্রে একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি গ্রহগণের গতিনির্ণয় করিয়াছেন এবং তাহারা যে নিয়মে আপন আপন কক্ষে ঘুরিতেছে তৎসম্বন্ধে তিনটী নিয়ম নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। নিউটন যখন মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম আবিষ্কার করিলেন, তখন তিনি প্রতিপন্ন করিলেন যে, মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম হইতেও কেপ্‌লার-নির্ণীত নিয়ম তিনটীতে উপনীত হওয়া যায়।

কেপ্‌লার

ইঁহারা আলোক সম্বন্ধীয় আধুনিক তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন। আলোকের কোনও স্বাধীন সত্তা নাই, পরমাণুসমষ্টির বিকম্পনে চক্ষুর উপর যে বোধ জন্মে তাহাকেই আমরা আলোক নাম দিয়া থাকি। আলোকের এই অভিনব তত্ত্ব হাইগেন্‌ ও ইয়ঙ্গ ইঁহারা উভয়ে আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন।

হাইগেন্‌ ও ইয়ঙ্গ

যাঁহারা বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই আমাদিগের গভীর কৃতজ্ঞতার পাত্র। এখানে সকলের নামোল্লেখ করা গেল না; জ্ঞান চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানদাতৃগণের বিষয় অবগত হওয়াতে চিত্তের পরম আনন্দ লাভ হয়। জ্ঞানানুশীলন দ্বারা মানুষ যতই মানসিক উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হইবে, ততই তাহার চিত্তের সংকীর্ণতা দূরীভূত হইবে, এবং

যে পরিমাণে মানবের প্রাণ উদার হইবে, সেই পরিমাণে মানুষ স্বদেশীয় ও বিদেশীয় জ্ঞান-গুরুগণের আনুগত্য স্বীকার করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিবে।

গৌরীর রূপ।

হিমালয়ে বাড়েন চণ্ডিকা।
আন বেশ দিনে দিনে শোভা অলঙ্কার বিনে
দেখি সুখী হইল মেনকা॥

অধর বন্ধুক বন্ধু বদন শারদ-ইন্দু
কুরঙ্গ-গঞ্জন বিলোচন।
প্রভাতে ভানুর ছটা কপালে সিন্দূর ফোঁটা
তনু-রুচি ভুবনমোহন॥

নাসাতে দোলয়ে মোতি হীরায় জড়িত তথি
বদন কমলে ভাল সাজে।
তুলনা যে দিতে নারি তাহে অতি মনোহারী
তারা যেন সুধাকর মাঝে॥

গৌরীর বদন শোভা লিখিতে না পারি কিবা
দিনে চন্দ্র নাহি দেয় দেখা।
ম্লান চাঁদ সেই শোকে না বিচারি সর্ব্বলোকে
মিথ্যা বলে কলঙ্কের রেখা॥

গৌরীর দশন রুচি দেখিয়া দাড়িম্ব বীচি
মলিন হইল লজ্জাভাবে।
অনুমান করি মনে ওই শোকের কারণে
পক্ককালে দাড়িম্ব বিদরে॥

শ্রবণ উপর দেশে হেম মুকুলিকা ভাষে
কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত কেশ-পাশে।
আষাঢ়িয়া মেঘ মাঝে, যেন সৌদামিনী সাজে
পরিহরি চপলিতা দোষে॥

শ্রীমুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী।